পশ্চাতে রেখেছ যারে

কাত্যায়নী দেবী

পরিবেশক
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬০

প্রকাশক

শ্রীইন্দ্রশেখর রায়

১৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১, মোহন বাগান লেন,

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ

মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক

টাওয়ার হাফটোন কোং

দাম দেড় টাকা

ভূমিকা

যে নারী-সমাজের দুর্বলতা সমাজের চরম দুর্দিনে জীবনের সংকট আরো ঘনিয়ে তোলে সে নারী-সমাজের মধ্যে কতখানি শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে এবং সেই শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কার্যে ব্রতী হলে নারীও যে-কোন অবস্থায় শক্তি সঞ্চার করে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার অদ্ভুত আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের সাতটি গল্পের মধ্যে।

বিভিন্ন অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এই সাতটি গল্পের সাতটি নায়িকা।

যে-সংস্কারের বন্ধন কর্মজীবনে নারীর সবচেয়ে বড় অন্তরায় সেই সংস্কারকে কাটিয়ে উঠে সত্য ও বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের যে মনোভাব প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা শুধু প্রশংসারই যোগ্য নয় অদ্ভুত বলিষ্ঠতায় চিত্রগুলি মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়ে চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে পুরুষ যখন ভেঙ্গে পড়ে, নারী তখন নিরুপায় হয়ে অদৃষ্টকে করাঘাত করে, বাঁচবার পথ নেই মনে করে মৃত্যুকে বরণ করবার চেষ্টা করে—এই আমাদের গতানুগতিক জীবন। অথচ আজকের মানুষ পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়, বলিষ্ঠ জীবনবোধ এই বাণীই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাহিত্যের মাধ্যমে এই মনোভাবের প্রকাশই প্রগতিশীল ও বলিষ্ঠ সাহিত্যের উপজীব্য।

এই মাপকাঠিতে বর্তমান গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্প সার্থক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে "বিপাশা' গল্পের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও

লাঞ্ছনাকে পদদলিত করে জীবনযুদ্ধে পরাজিত স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসতে নারীর জন্য যে কর্তব্যপথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ততখানি বলিষ্ঠতার পরিচয় আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যেও সুলভ নয়।

সদ্য জেলমুক্ত বিপাশা বন্ধু নর্মদার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় এক চরম সংকট মুহূর্তে। ভগ্নহৃদয় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পথের সন্ধান না পেয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। স্বামীর পাগল হওয়ার অবস্থা, স্ত্রী আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই স্থির করে বসে আছে।

বিপাশার উৎসাহ বাক্যগুলো ওরা দুজনেই ভাববিলাস বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু নাছোড়বান্দা বিপাশা জবাব দেয়, 'এমনিতেই মরছে দেশ, একটু হাত-পা ছুঁড়ে মরতে দোষ কি?' নর্মদাকে সে বাঁচবার পথ বাতলে দেয়, বলে, 'অপূর্ব সুন্দরী নোস্—বয়সও ত্রিশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে, দারিদ্র্যে চেহারা লালিত্যশূন্য, ভয় কিসের? লজ্জাই বা কিসের!···হার মানিস নে, দুঃখ তোর ত একার নয়, সারা দেশটাই দুঃখে জর্জর হয়ে আছে···বাঁচবার চেষ্টা কর্। বাঁচার আদর্শ দেখা, দেশের সেইটাই আজ বড় প্রয়োজন।' 'পুরুষের সঙ্গে তাল ঠুকে লেখাপড়া শেখা, ট্রামে বাসে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, ভীড়ে চাপাচাপি হয়ে যথা ইচ্ছা বিহার—এগুলোই স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম লাভ মনে করে বসে থাকবি তা হলে চুপ চাপ?' জীবনযুদ্ধে কোমর বেঁধে পুরুষের পাশে দাঁড়ানোর নামই সত্যিকার সমানাধিকার। একা একটি পুরুষ পারছে না আজ এতগুলি প্রাণীকে বাঁচাতে। তুইও চেষ্টা কর্, তাতে অপমান ত নেই-ই, বরং সম্মান আছে যে তুই হার মানিস নি, ফুরিয়ে যাস্ নি। এখন বাঁচ, বাঁচা তোর স্বামীকে। কাজ কর্, সাহস শক্তি আপনিই এসে যাবে।'

সেলাইয়ের কল কেনবার জন্যে নিঃস্ব নর্মদাকে বিপাশা স্বামীর দেওয়া বিয়ের উপহার প্রতিকৃতি-সম্বলিত লকেটটা বেচবার প্রস্তাব করে বলে, 'মিথ্যে সেণ্টিমেণ্টালিটি তোকে ছাড়তে হবে। মরেই যাচ্ছিলি আত্মহত্যা করে।' তারপর বাইরে বেরুবার সময় নর্মদার সংকোচ লক্ষ্য করে বিপাশা বলে ওঠে, 'শায়া নেই? না থাকে কোনও দ্বিধা আজ তোকে করতে দেবো না—জীবনযাত্রার সহজ পথে বাঁচার জন্যে যে পথ আজ একান্ত প্রয়োজন সেই পথে তোকে আজ দীক্ষা দিয়ে যাব।···নিজেকে ত তুই রক্ষা করবিই, আরও আদর্শ হবি তোর পারিপার্শ্বিক দুস্থ সমাজের।'

যক্ষমাগ্রস্ত একমাত্র পুত্রের চিকিৎসার প্রয়োজনে মদ্যপ ও লম্পট অথচ অর্থশালী দাতা প্রাণকৃষ্ণের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করে না সরযূ। নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ত আছেই, পুত্রের প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে যে-কোন মূল্য দেওয়ার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই যায়।

যে সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় এবং কর্তব্য সাধনে যে অপরিসীম দৃঢ়তা প্রতিটি গল্পের প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে তা কেবল একজন সাধারণ লেখিকার পক্ষেই প্রশংসার যোগ্য নয়, এ জাতীয় সৃষ্টি নিয়ে যে-কোন স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক গর্ব বোধ করতে পারেন।

আজ এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এ ধরণের গল্প রচনা সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ও শক্তি সঞ্চারে সহায়তা করবে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

১২।১২।৫৯ বাঃ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

উৎসর্গ

বাংলার মেয়েদের হাতে

লেখিকার অন্যান্য বই

হেমাঙ্গিনীর সংসার (উপন্যাস)

কাহিনী এতই বাস্তব যে মনে হইবে আপনারই অতি পরিচিত পরিবারের ঘটনা। বহু বহু সংসারে শনৈঃ শনৈঃ এই সত্যই অনিবার্য হইয়া উঠে : কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় "দোষ কারও নয়।" ইহার লিপি-চাতুর্য এমনি চিত্তাকর্ষক ও স্বচ্ছ যে পড়িতে বসিলে শেষ না করিলে উঠা যায় না।

কেদারবদরী পথে (ভ্রমণ-কাহিনী)

গল্পের মত সবল অথচ প্রতি নিয়ত পথের আবশ্যকীয় তথ্য-পূর্ণ। লেখিকা নিজে পথে যে সকল আবশ্যক অনুভব করেছেন এবং পথিকের দরদী হিসাবে কিসে শ্রম লাঘব হয়, কোথায় কোন্ জিনিষ সংগ্রহ করতে হয়, কি কি দেখতে হয় সমস্তই লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ গাইড্।

কবচ (গল্প সঞ্চয়) যন্ত্রস্থ

পশ্চাতে রেখেছ যারে

স্বাতির জন্মদিন !

ভোর বেলা উঠিয়া আগে গিয়াছিল পিতার পদধূলি লইতে —"বাবা আজ আমার জন্ম দিন !"

"তাই নাকি, ইস্ বড্ড ভুলে গেছিত ? কাল কেন মনে পড়াস নি দুষ্টু মেয়ে, এখন আমি কি করি।" "কেন বাবা, কিসের কি করবে ?" বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল স্বাতি। —"বাঃ রে, তোকে যে এবার একটা সিরিঞ্জ দেব ভেবেছিলাম, তুই ভাল ইন্‌জেকসান দিতে শিখেছিস। এঃ এখন কি করি বলত !"

পিতার কথায় স্বাতির চোখ দুটো সেদিন আনন্দে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—"সত্যি বাবা ! আমায় তুমি সিরিঞ্জ দেবে ? আমি চিকিৎসা করতে পারব ? কি আনন্দ যে হ'চ্ছে আমার।"

সত্যপদ উত্তর করিয়াছিলেন, "আমারও সেদিন কি আনন্দই যে হয়েছিল মা ! গেল বার কলেরার মরশুমে যখন তুই আমায় এ্যাসিষ্ট করলি, বিপিন কম্পাউণ্ডারও হার মেনে গিয়েছিল তোর কাছে। আমার বড় ইচ্ছে করে মা তোকে ডাক্তারী শেখাই খুব ডিগ্রিধারী নয়—এমনি গাঁয়ের গরীবদের জন্য হাতুড়ে ডাক্তার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, আমাদের দেবী সুভদ্রা—আহতের সেবায় আত্ম নিবেদন করেছিলেন বলেই না—তাঁদের নাম অক্ষয় হ'য়ে আছে"—

"তবে দাওনা বাবা তোমার ওই কুড়ি সি, সি, সিরিঞ্জটা, ওটা হাতে নিলে আমার মনে কেমন অদ্ভুত বল আসে—সেই যেমন মা গল্প বলতেন বত্রিশ সিংহাসনের কথা ? তেমনি"—

কার্ত্তিকের কাছাকাছি, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ভোরবেলা বাক্স খুলিয়া বাহির করে স্বাতি সেই সিরিঞ্জটি—চার বৎসর আগেকার মধুর এক প্রভাতের স্নেহ আশীর্ব্বাদ !

মাতা, পিতা, বন্ধু সবই তিনি একা ছিলেন স্বাতির। দরিদ্র গ্রাম্য চিকিৎসক—অত্যন্ত দয়াপ্রবণ উদার হৃদয় ছিলেন তিনি। কলা, মূলা, গুড়, পাটালী যে যাহা পারিত দিত—পিতাপুত্রীর তাহাতেই চলিয়া যাইত স্বচ্ছন্দে।

বহু সময়ে, বিশেষ করিয়া কলেরার মরশুম যখন আরম্ভ হইত, তখন ঘর হইতে সেলাইন লইয়া ইনজেকসান করিতেন। তিনি ঔষধের মুল্য কদাচিৎ পাইতেন—মূর্খ, অজ্ঞ চাষীদের উঠানে ধান উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে—মহামারী রূপে দেখা দিত কলেরা—নোনা কাঁকড়া, খেজুর রস, নতুন চাউল চাষী পাড়ায় মাস দুই ধরিয়া চালাইত বিপ্লব, সত্যপদর একা সামর্থ্যে কুলাইত না, সঙ্গে বিপিন কম্প্যাউণ্ডার ও স্বাতি থাকিত—মৃত্যুর মুখ হইতে—তিনি ছিনাইয়া আনিতেন অনেক কটি প্রাণ প্রত্যেক বৎসর !

কম্পাউণ্ডার মাঝে মাঝে ছয়লাপি কাণ্ড দেখিয়া নিজেরই পেট কামড়াইতেছে বলিয়া সরিয়া পড়িত—কিন্তু স্বাতি কর্ত্তব্যে অটল রহিত।

তারি পুরস্কার! পিতার অন্তর্নিহিত বাসনার প্রতীক কুড়ি সি, সি, সিরিঞ্জটা।

সেবার অগ্রাণের পরেই আরম্ভ হইয়াছিল মহামারী। খেজুর রস আর নোনা কাঁকড়া বিপদ ঘটাইয়াছিল প্রথমে বাগদী পাড়া পরে কামার পাড়া, গোয়ালা পাড়া সব, সমস্ত গ্রামটিতেই—

সত্যপদ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন সমস্ত বাড়ী বাড়ী যাহার হয় নাই তাহাকে ভ্যাকসিন দিয়া যাহার হইয়াছে—তাহাকে সেলাইন দিয়া। কিন্তু কালটি হইল আস্ত কলি! লোকের যে ভাল করে—ভগবান তাহার ভাল দেখেননা। একদিনের নোটিশেই সত্যপদ চলিয়া গেলেন—পরপারে,—পিতৃশোকে কাতর হইলেও স্বাতি গ্রামের সেবা বন্ধ করে নাই—অদৃশ্য শক্তি তাহাকে যেন পরিচালিত করিত, যেন সে অনুভব করিত পিতারই সান্নিধ্য।

কিন্তু স্বাতি ত পুরুষ নহে নারী, অভিভাবক শূন্য হইয়া নাকি তাহাকে থাকিতে নাই তাই সম্পর্কের এক মামা কোথা হইতে আসিয়া, স্বাতির পিতার বাড়ীটুকু সামান্য দু-এক বিঘা যাহা কিছু জমীজমা বিক্রয় করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং বুড়ো হাতি মেয়েকে বেশী দিন খাইতে না দিয়া—যথা সম্ভব শীঘ্র একজনদের বাড়ীর বৌ করিয়া বিদায়ও করিয়া দিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর মাতুল গৃহে এবং মাতুল গৃহ হইতে স্বামীর ঘর!

নিশ্বাস ফেলিবার অবসর হইয়াছিল স্বাতির তাহার পর। পুত্রের ন্যায় সহজ, সাহসী করিয়া গড়িয়াছিলেন তাহাকে সত্যপদ, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে ছিল নারীর সহজাত গুণগুলি। সেবা গুণ, স্নেহপ্রবণতা সহনশীলতা ছিল স্বাতির অপরিসীম।

দরিদ্র কটুভাষী স্বামী ও মন্ত্রণাদায়িনী শাশুড়ীকে সে আপনার অদৃষ্ট বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল উদার ক্ষমা সুন্দর মন দিয়া ক্ষমা করিয়াই চলিত সে, নীরবে সেবা করিত স্বামী শাশুড়ী ও পরিজনদের।

কিন্তু তাহাতেও সুখ ছিল না—যাহারা কলহ চায়—তাহারা একতরফা নীরবতা সহ্য করিতে পারেনা। স্বাতির ক্ষমাকে দেমাক, অহঙ্কার, গরব যখন যা খুসী বলিয়া গঞ্জনা দিতে ছাড়িত না—তাহার শাশুড়ী ননদ জায়েরা।

পারেনা স্বাতি আর! মাঝে মাঝে মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়া উঠে, দুস্বপ্নের মত—মাঝে মাঝে কানে ভাসিয়া আসে শেষ জন্মতিথির আশীর্ব্বাচন পিতার।

দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া আপনাকে নিবিষ্ট করিতে চায় সে সংসারের সেবায়—কিন্তু! বিদ্রোহী মন যেন তাহাকে আজ-কাল আরও কি শোনাইতে চাহে, দেখাইতে চাহে, আরও কোনও মহত্তর পথ, স্বাতি মনকে চাপিয়া রাখে—কর্ণে শুনিতেও চাহেনা, কিন্তু ভুলিতে পারেনা—গোপনে মাঝে মাঝে খুলিয়া দেখে পিতৃদত্ত স্নেহোপহার সেই সিরিঞ্জটা। কত উচ্চাশা ছিল সেই উপহার দেবার পশ্চাতে! দু-চারি দিন অন্তর—ঝাড়িয়া

মুছিয়া পরিষ্কার করে সে পিতার ডাক্তারীর সাজসরঞ্জামে পূর্ণ ব্যাগটি। স্পিরিট বুলাইয়া পরিষ্কার করে সিরিঞ্জের নিডেলগুলি।

স্বাতির পিতার সবকিছু, মায় জামা জুতাগুলিও লইয়াছিল অভিভাবক মামা—কেবল ডাক্তারী ব্যাগটা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল স্বাতি, মামাও সেই ছাল চটা রং ওঠা ব্যাগটার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই।···স্বাতির ধ্যানমগ্নতা ভাঙ্গিয়া যায়—বাহিরে কে কাঁদিতেছে না? ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হয়। বাগ্দীপাড়ার রাজকুমার পাড়ুই—

স্বাতির শাশুড়ীর পায়ের নিকট বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে—"মাঠান! সেই জ্বর হয়েছেন আমার বোঁচার।" সেই জ্বর মানে ম্যালিগন্যাণ্ট ফিবার! পর পর কতকগুলো প্রাণ গেল। চিকিৎসক নাই গ্রামে, দূর গ্রামে গিয়া চিকিৎসক ডাকিয়া আনিতে আনিতে রোগী মারা যায়—দেখিয়াছে স্বাতি! বিবাহ হওয়ার পর অনেক কটি দেখিয়াছে —"বোঁচা আমার বাঁচবে না মাঠান, অন্নদা ঠাকুরের মেয়ে গেল, সেদিন করিম ভাইয়ের বউ গেল, তুমি একটু চন্নামেত্তর দেও মাঠান ছেলের মাথায় দেইগে—"

কাঁদিয়া পায়ের উপর লুটাইয়া পড়ে রাজকুমার! বিদ্রোহ যখন আসে, এমনি করিয়াই আসে, বন্যার মত ভাসাইয়া লইয়া যায় সব বাধা সংকোচ, দুর্দ্দান্ত সাহস আসিয়া যায় হঠাৎ কেমন করিয়া স্বাতির মনে—পিতার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসে—একেবারে রাজকুমারের পাশে

দাঁড়ায় "চল পাড়ুই আমি তোমার ছেলেকে দেখব—বাবার কাছে আমি ডাক্তারী শিখেছিলাম—এখনও ভুলিনি, চল তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারি কিনা দেখব! বজ্রপতন হইলেও মানুষ যত না স্তম্ভিত হয়—তাহাপেক্ষা অধিক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন স্বাতির শাশুড়ী—কি কথা বলিয়া তিরস্কার করিবেন—তিনি জাগ্রত না স্বপনে শুনিতেছেন তাহাও যেন বুঝিতে ছিলেন না।

হঠাৎ কর্ণে প্রবেশ করে রাজকুমারের কণ্ঠস্বর—"তুমি যাবা মা লক্ষ্মী? তুমি গেলি আমার বোঁচা নিশ্চয় বাঁচবে, তোমার পার ধুলো পালি আমার বোঁচার অকল্যাণ হবেনা—ও মালক্ষ্মী? চল মা চল—"

সম্বিৎ হারা চিত্তে সম্বিৎ ফিরিয়া পান স্বাতির শাশুড়ী ঠাকুরাণী—"হারামজাদী! তুই এবার মর্দ্দাণী করতে পাড়ায় বেরুবি? ঝাঁটা মেরে বিদেয় কোরব মনে থাকে যেন—"

দৃকপাত না করিয়া স্বাতি ডাকে—"চল পাড়ুই দেরী হলে ছেলেকে বাঁচান যাবেনা চল।"

বেশী দূর নহে! সকলকে স্তম্ভিত করিয়া স্বাতি পৌছিয়া যায় পাড়ুই পাড়া, রাজকুমার পাড়ুইএর কুড়ে ঘরে। মনে অদম্য সাহস, চরণে অফুরন্ত দৃঢ়তা তাহার!

রাজ কুমারের উঠানে তখন বিরাট জটলা। কে কবে এই জ্বরে মরিয়াছে, কাহার ভাগ্যে ডাক্তার দেখান ঘটিয়াছিল ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই কে অক্কা পাইয়াছিল ইহারই ফিরিস্তি

লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। হরিশ পাড়ুই যদি একরকম বলে ত গিরিন্দর পাড়ুই আর একরকম বলিয়া একটু উপরে উঠিতে চাহে—আবার গিরিন্দরও যে অভ্রান্ত নহে ইহা প্রমাণ করে ছলিম মিঞা। দাওয়ার উপর বার-তেরো বৎসরের একটি বালক শতছিন্ন দুর্গন্ধ একখানা কাঁথার উপর পড়িয়া আছে, আচ্ছাদনের কাঁথাখানি পায়ের নিচে পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও হুঁস নাই যে অনাবৃত দেহটি ঢাকিয়া দেওয়া প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের নিচু শ্রেণীর মেয়েরা মাঠে ঘাটে সবত্রই বেড়াইয়া থাকে লজ্জা সরম করিলে তাহাদের চলেনা। কিন্তু বাড়ীতে! তাহার উপর উঠান ভর্তি গণ্য মান্য মোড়ল মাতব্বর—পাড়ুইবৌ পুত্রের নিকট একবারও বসিতে পায় নাই—সেই ভোরের কাক ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠানে জটলা আরম্ভ হইয়াছে সেও উই দূরে একগলা ঘোমটা টানিয়া গিয়া বসিয়াছে, মাঝে মাঝে ফুৎ ফুৎ শব্দ ওঠায় বোঝা যাইতেছে যে সে কাঁদিতেছে।

স্বাতি টেম্পারেচার লইয়া দেখে একশো ছ' ডিগ্রি জ্বর। মিস্ট কণ্ঠে পাড়ুই বৌকে ডাকিয়া বলে "যাওত বৌ কলসী করে জল আন, তোমার ছেলের মাথায় জল ঢালতে হবে তা'হলেই জ্বর কমবে, যাও লজ্জা কোরনা—আর পাড়ুই তুমি যাওত খুব বড গোটা কলার পাতা একখানা আনত, মাথাটা তুলে দেবে সেই পাতার ওপর পাতা বয়ে জল গড়িয়ে দাওয়ার নিচে চলে যাবে, শীগগীর যাও। ও ভাই ও খোকা শোন ত!"

কর্ম্মকার পাড়ার একটি তরুণ ছোকরা দাঁড়াইয়াছিল দর্শক রূপে—ডাকে তাহাকেই স্বাতি—"তুমি ত দেখি সাইকেল করে বেড়াও—আছে না সাইকেল? আমি এই ওষুধ দুটো লিখে দিচ্ছি বালীপুকুর হতে এনে দাওনা ভাই, ওঃ টাকা? এই নাও আমার আংটিটা দিচ্ছি—দোকানে রেখে ওষুধ এনো পরে পাড়ুই হিসেব কিতেব করবে! এই নাও এই ওষুধগুলো গ্লুকোচ আর কুইনিন বেশী কিছু নয়—তুমিত ছেলেমানুষ যাও লক্ষ্মী ইতস্তত কোরনা, ছেলেটা বেঁচে যাবে, যাও।" তথাপিও ছেলেটি কিছু ইতস্তত করিতে থাকে—মাতব্বর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠে "যাও খোকা উনি যখন বলছেন, দেখ ওষুদ পড়লি যদি বাঁচে"—মুখ মচকাইয়া হাসে সবাই, স্বাতির চোখেও তাহা এড়াইয়া যায় না—কিন্তু কোনও দিকে দৃকপাত করেনা। সে জল ঢালিতে লাগে ছেলেটির মাথায়। কলাপাতা বহিয়া দাওয়ার নিচে পড়িতে থাকে জল। পাড়ুই বৌকে ডাকিয়া বসায় ছেলের মাথার নিকট—হাওয়া করিতে বলে জোরে জোরে। ভিজা গামছায় উত্তমরূপে গা মুছাইয়া ছিন্ন কাঁথাখানিতে তাহার পর বেশ করিয়া গা ঢাকিয়া দেয়!

ব্যাগ খুলিয়া সিরিঞ্জ বাহির করে—আকুল আগ্রহে তাহার পর তাকাইয়া থাকে পথের পানে! মনে থাকেনা স্বাতির সে কে! কোথা হইতে কাহার বাড়ী আসিয়া বসিয়া আছে,—সমস্ত চৈতন্য তাহার ঘেরিয়া থাকে রোগীটিকে বাঁচাইতে হইবে! বাঁচাইবই উহাকে!

ঘণ্টা খানেকের ভিতরেই ঔষধ আসিয়া যায়—হনুমান গন্ধমাদন আনিলে সুষেণ কত খুসী হইয়াছিলেন তাহা জানেনা স্বাতি, তবে ঔষধ পাইয়া সে যেরূপ খুসী তাহার তুলনা নাই !

তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠে তাহার ওষ্ঠে—চারি বৎসরের অনভ্যস্ত হাত তাহার একটুও কাঁপেনা—মনে পড়ে পিতার স্নেহ সুন্দর মুখ, কর্ণে শুনিতে পায় সেই অমৃত বাণী—তুই চিকিৎসা করবি, কত গরীব দুঃখীর তুই প্রাণ বাঁচাবি স্বাতি আশীর্ব্বাদ করছি আমি'—

দেখাইয়া দিবে স্বাতি সময় মত চিকিৎসা করিতে পারিলে মানুষ বাঁচে, বাঁচান যায় মানুষকে ! সীতার অগ্নি পরীক্ষা অপেক্ষা স্বাতির এ পরীক্ষা কম নহে—উঠানের দিকে প্রতি নিমিষে একবার দেখিয়া লয় স্বাতি—মানুষের মস্তক সেখানে অগুনতি, তাঁহাকে—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাকে হইতেই হইবে, কুড়ি সি, সি, সিরিঞ্জটাই সে তার যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র হিসাবে লয়। হোক কুড়ি সি, সি, পিস্টন খুলিয়া আবার ভরিয়া লইবে গ্লুকোচ। পঁচিশ সি, সি, গ্লুকোচ আর দশ সি, সি, কুইনিন মিশাইয়া ইণ্টার ভেনাস ইনজেকসান দেয় স্বাতি—ডাক্তার নয় সে—জানেনা বিশেষ কিছুই চিকিৎসা বিষয়ে, কিন্তু দেখিয়াছে পিতার চিকিৎসা—শুনিয়াছে অনেক কথা চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে, সাধারণ জ্ঞান তাহার প্রচুর !

অনেক দিন পড়িয়া থাকা রবারটা কাটিয়া গেছে, রাজ-কুমারকে বলে "ধরত পাড়ুই জোর করে চেপে, বলব যখন

তখন আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবে—।"

ঘণ্টা খানেক পরে জ্বরের উত্তাপ কমিতে থাকে, মাথায় জল ঢালার বিরাম নাই। কলসীর পর কলসী ভরিয়া জল আসে, ঘটি ভরিয়া ভরিয়া ঢালে রোগীর মাথায় স্বাতি, ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাকায় ছেলেটা।

"পাড়ুই একটু ছানার জল আনত তোমার ছেলের মুখে একটু একটু দেব! ডাবের জলও দেওয়া যেতে পারে ডাবও আন পেড়ে" আদেশ জানায় স্বাতি! ডাব আনিয়া সসঙ্কোচে বলে রাজকুমার "মালক্ষ্মী সারা দুপুর তুমি উপবাসী রয়েছ, একটা ডাব তুমি সেবা কর আমার বোচার কল্যেন হোক।"

ছেলের কল্যাণের নাম করিয়াছে পাড়ুই বিনা প্রতিবাদে স্বাতি একটা ডাব খাইয়া লয়!

চার ঘণ্টা বাদে আবার ইনজেকসান পড়ে গ্লুকোজ কুইনিন মিশাইয়া—জ্বরের উত্তাপ একশো দু'ডিগ্রীতে নামিয়া আসে!

চোখ মেলিয়া রোগী জল খায় বেশ ঢক ঢক করিয়া—স্বাতি বলে "পাড়ুই এবার বাড়ী যাই! ছেলে তোমার বেঁচে গেল। ততক্ষণ তোমার বড় ডাক্তারেরও প্রায় আসার সময় হ'ল, তিনি এসে এবার ওর চিকিৎসা করবেন—আমিত বাবা ডাক্তার নই!"

ব্রাহ্মণের ঘরের বধূ সারাদিন তাহার দাওয়ায় বসিয়া থাকিবে একথা রাজকুমার কখনও ধারণা করিতেও পারে নাই। স্বপ্নাতীত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—

এই জ্বর হলে যে রোগী বেঁচে চোখ মেলিয়া তাকায় তাহা স্বপ্নাতীত—

দ্বিরুক্তি করেনা রাজকুমার "চলো মা লক্ষী সঙ্গে করে দে আসি তোমারে! ওরে বৌ মাথায় জল দেওয়া যেন কমাই দিসনে। দেখলিত? ক্যাবল কাঁদতে ছিলি একটু জলও ঢালতে পারিসনি! নে-নে মা লক্ষ্মী'র পা'র ধুলো মাথায় নে আমার বোঁচার মাথায় দে, পবিত্তুর হ'ল আজ আমাদের ঘর"—পড়ুই দম্পতি গড় হইয়া স্বাতির পায়ের ধুলি মাথায় মাখিয়া লয়!

সারাদিনের অনাহারে দুর্দ্দম উত্তেজনার অবসানে অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল স্বাতির দেহ—দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়ায়, সোজা হইয়া থাকিতে পারেনা, উচ্চকণ্ঠে রাজকুমার হাঁক দেয় "মাঠান! মাঠান গো বৌমা লক্ষ্মী এসেছেন দোর খোল—"

গম্ভীর কণ্ঠে ভিতর হইতে উত্তর আসে "বান্দীবাড়ী গিয়ে যে গেরস্তর বৌ মদ্দানী করে, তার জায়গা এ বাড়ী হবেনা যেতে বল সেখানে সারাদিন মদ্দানী করছিল সেখানে"।

"ওমা! সেকী রকম কথা মাঠান, মাপ কর মাঠান, আমার ছেলেডা বেঁচে গেল বৌমা লক্ষ্মীর জন্যি তুমি তারে ক্ষ্যামা কর মা," বৃথা কাকুতি মিনতি করে রাজকুমার, কোনও সাড়া আসেনা ভিতর হইতে।

"ও দাদাঠাকুর, ও দিদিঠাকরুণ, ও মাঠান ওগো আমি ঘাট মানছি ক্ষ্যামা কর গো তোমরা মালক্ষ্মী সারাদিন উপোসী, দোরডা খোল—ওগো দিদিঠান—"

উঠিয়া দাঁড়ায় স্বাতি। 'থাক্ পাড়ুই, চলো তোমার বাড়ীই যাই, মেয়েকে দুটো খেতে দিতে পারবে না বাবা?"

"ওকি কথা মালক্ষ্মী, খাতি দেব না! মাথায় করে রাখব তোমাকে, কিন্তু মা আমরা যে ছোটলোক, ছোট লোকের বাড়ী তুমি কেমন করে থাকবা মা?"

ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠে স্বাতির মুখে, "তোমরা ছোট লোক নও পাড়ুই! দূরে রেখেছে যারা তোমাদের ছোট বলে ছোট হয়ে যাচ্ছে তারাই দিন দিন, বড় বলে তারা বড় ভুল করেছে, ভালই হ'ল পাড়ুই, আমার বাবার বড় আশা ছিল আমি রোগীর সেবা করে জীবন কাটাব, চল বাবা—তুমি আমার রক্ষক হ'যে সঙ্গে থেক—ছোটলোক বলে··যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে সমাজ, আজ থেকে তাদের সেবাই হবে আমার জীবনের ব্রত! চল আর দেরী নয়···চল—"

বীরা

আর্ত্তনাদের মত বেজে ওঠে দরজার কড়াটা। নিবিষ্ট মনে চিঠি পড়ছিলাম, ছোট্ট একটুকরো চিঠি—কতবার পড়া, জরাজীর্ণ ভাঁজে ভাঁজে কাট ধরা চিঠি! আমার অজয়ের সে চিঠি! নিঃসহায় বিধবার একমাত্র ছেলে সে দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ বন্দী আছে কোথায় কোন দেশের বন্দীশালায়—ঠিকানা জানবার উপায় নেই শুধু জানায় মাঝে মাঝে সে যে বেঁচে আছে—তারি একটু সঙ্কেত—অতি সাধারণ ছোট্ট একটু চিঠিতে।

দুঃখিনী মায়ের কাছে এটুকুর মূল্য অনেক—সরকারের এ দয়াটুকুর জন্য জননী ধন্য। মধ্যাহ্নের অখণ্ড অবসরে নিত্য নিয়ে বসি সেই টুকরো শতছিন্ন মলিন কাগজটুকু, শতবার পড়া হলেও সেযে আমার অজয়ের চিঠি! যতদিন না আসে আর একখানা—ততদিন সেখানাই সম্বল। চোখ পড়ে থাকে চিঠিটুকুর ওপর, মন চলে যায় বিস্মৃত স্মৃতির সাগর মন্থনে ছোট্ট অজয়ের কত দৌরাত্ম্য উৎপাত মধুর কাহিনীর সন্ধানে।

মস্ত একখানা ভাঙ্গা শ্লেট বগলে—ন্যাংটা অজয় বাড়ীর ছেলেপিলের সাথে চলত পাঠশালায়। কোন মানা শুনত না, ধরে রাখলে চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ করত। শ্বশুর বলতেন "ছেড়ে

দাও মা স্কুলে গিয়ে বসে থাকবে, ওর খুব বিদ্যে হবে দেখো তুমি!" পাড়ার লোকের বেঁধে রাখা গরু ছাগল সে খুলে দিত। কিছু বল্লে বোলত "বাঃ কষ্ট হবে যে বাঁধা থাকতে ওদের।" স্বাধীনতার সংজ্ঞা ছিল তার জন্মগত, ভারতমাতার বন্ধন মুক্তির জন্যে তাই বুঝি প্রাণ উৎসর্গ করেছিল বড় হয়ে। ভাল বাসতাম, সন্তানকে ভাল কেনা বাসে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে যেতাম দেখতাম তার মধ্যে আমার ধ্যানের ঠাকুর আমার ইষ্টদেব—মহেশ্বরের মহীয়ান রূপ।

শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করতে গিয়ে চমকে যেতাম মাঝে মাঝে। বুকে তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে জানাতাম হয়ত শ্রদ্ধাই। পরম সুন্দর উলঙ্গ শিশু ছিল তখন সে—নির্বিষ্ট মনে ছাইগাদায় বসে ছাই মেখে আসত টলতে টলতে আমার অজয় বলে কিছুতেই তখন ভাবতে পারতাম না—অবাক হয়ে চেয়ে রইতাম বিশ্ববিমোহন সে রূপের দিকে।

বড় হ'যে ঠাকুরদাদার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে প্রেসিডেন্সি কলেজের সব সম্মানগুলোই সে একা নিয়েছিল বি-এস্-সি পর্যন্ত তারপর কেমন করে নজরে পড়ে গেল মহামান্য সরকার বাহাদুরের। সব কিছু উচ্চাশা জলাঞ্জলী দিয়ে—চলে গেছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই, মুক্তি নেই আজও তার। একটানা চলেছে তার কারাদণ্ড···শুনি এই মুক্তি পেল আবার শুনি মুক্তি পেয়েই আবার হয়েছে কারারুদ্ধ।

দুঃখিনী মায়ের ভাগ্যে ঘটেনি তাকে কাছে পাওয়া, শুধু তার পুরোণো চিঠিগুলো দেখি—ভেবে চলি তার বাল্য-কৈশোরের অসংখ্য কাহিনী দুপুরের অখণ্ড অবসরে বসে। জানিনা এই প্রেম সব চাইতে বড় কিনা যে বাৎসল্য স্নেহে বাঁধা পড়েছিলেন স্বয়ং ভগবান সে বাৎসল্য স্নেহ, যশোদার প্রেম সব প্রেম সব সাধনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা! সে বিচার করতে আমি চাইও না—আমি শুধু করে চলি সাধনা স্নেহের তপস্যা।

দরজার কড়ার আর্তনাদ আমার তপস্যা ভাঙ্গিয়ে দেয়, একটানা করুণ আর্ত্তনাদ আমাকেই যেন ডাক দেয়। কি যেন মনে হয় ছুটে গিয়ে দরজা খুলি। বিদ্যুৎ গতিতে ঢুকে প'ড়ে—খিল লাগিয়ে দেয় একটা মেয়ে—বিস্ময়ের ঘোর কাটাবার আগেই পায়ের কাছে বসে পড়ে মেয়েটি—"আমায় একটু আশ্রয় দিন মা—পেছনে তাড়া করে আসছে আই বি পুলিশ; সঙ্গে আমার ভয়ানক জরুরী কাগজপত্র, সর্ব্বনাশ হবে এগুলো ওদের হাতে পড়লে অনেকগুলো লোককে ওরা মারবে এই প্রমাণ নিয়ে, রক্ষে করুন আমায়, আরও অনেক কটা ছেলেকে মেয়েকে। আপনার নিশ্চয় সন্তান আছে মা, মনে করুন তার কথা—"

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপে মেয়েটি। মুখখানা রক্ত-হীন ফ্যাকাসে মনে হয় ভয়ে। মুহুর্ত্তে মনের মধ্যে উদয় হয় আমার অজয়ের শেষ বিদায়ের দৃশ্য। পারিনি রক্ষা করতে

তাকে···বুদ্ধি ছিল না তখন···অভিজ্ঞতা পাকেনি। বাঁচাব বাঁচাব একে আমি। দৃঢ় হ'য়ে ওঠে আমার মন, কাগজের মস্ত পুলিন্দাটা নিয়ে পেট কাপড়ে গুঁজে ফেলি···"চল মা ভয় নেই তোমার! ওপরে চল!"

কড়া নাড়া শুরু হয়ে যায় ততক্ষণে। করুণ আর্ত্তনাদ মায়ের ধ্যান ভাঙ্গান শব্দ নয় আর, সদম্ভ হাতের নাড়া। কেয়ার করিনা···খাটে শুতে বলি মেয়েটিকে লম্বা ফালি নেকড়া ভিজিয়ে তার কপালে মস্ত পটি লাগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিই "ও রামচরণ দুরজা খোল বাবা···কে এলো আবার অসময় দেখরে···কত ঘুমুবি?"

শুনতে পাই দোর খোলার শব্দ, শুনতে পাওয়া যায় উত্তেজিত কথপোকথন "বল্ কে এসেছে একটু আগে কোথায় গেল সে?" "ভাল! এসবে কে বাবু···এই দোর খুলনু তোমাদের"···"না না···ওকথা শুনব না এসেছে একটা মেয়ে এক্ষুনি···ভয়ানক ধূর্ত্ত সে কিন্তু আজ আর শুনছি না···দেখেছি এই বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত আসতে।"

হেসে উঠে রামচরণ···"ভুল করেছেন বাবু কেউ এসেনি আমিত এইখেনটায় শুয়ে আছি···"

"চোপ্ শয়তান! মিথ্যাবাদী, চল্ দেখব তোদের বাড়ী এই দেখ সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট আছে।"

কথাবার্ত্তা কাছিয়ে আসে···ততক্ষণে মোছামোছা করে মেয়েটির কপালে সিঁদুর দেওয়া হ'য়ে গেছে আমার···চূর্ণ

কুন্তলে ঢাকা দিয়ে ফেলেছি তার কপোল, কপালে লম্বা জলপটি, মাথার কাছে বসে বাতাস কচ্ছি মৃদু মৃদু—দেহটা ছেড়ে দিয়ে যথার্থ রোগীর মতই ক্লান্ত নয়ন মুদে পড়ে আছে মেয়েটি।

মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে বলি একটু আস্তে কথাকও রামচরণ, বৌমার জ্বর একটু কমে আসছে, হয়ত ঘুম আসতেও পারে। ওঁনাদের ব্যবসাই যখন এই···তা দেখাওগে সব ঘর দোর খুলে। ভদ্রলোক (?) দুজন তাঁদের মিলিটারী হাটনটা একটু সংযতই করেন···কিন্তু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে খাটের তলটল গুলো দেখে নিতে ছাড়েন না। শয্যালীনা মেয়েটির মুখের দিকেও তাকান বারবার, কিছু বলতে বা করতে বোধহয় সাহস হয় না। তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ান তাঁরা ঠাকুর ঘর, রান্নাঘর মায় পাইখানা পর্য্যন্ত। কিন্তু আশা মেটে না, শয়তান মেয়েটাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে আবার ঢোকেন আবার আমার ঘরে···

পেট-কাপড়ে গোঁজা মোটা তাড়াটা যেন সূঁচ ফোটায় আমার গায়ে, ঘাম দেখা দেয় বিন্দু বিন্দু মুখে···কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে মেয়েটি··আশ্চর্য্য লাগে তার প্রশান্ত নির্ভীক মুখ দেখে সাহস আসে, প্রেরণা আসে অন্তর হ'তে।

একটু উষ্ণস্বরেই বলি রোগীর ঘরে কেন উৎপাত করছেন বলুনত! সারাদিন ছট্‌ ফট্‌ করে একটু শান্ত হয়েছে···একটু বিশ্রাম আমিও নিতে পারি আপনারা রেহাই দিলে।

২

"ক্ষমা করবেন, সত্যিই বড় ডিষ্টার্ব করলাম আপনাদের। কিন্তু জানেন না কি ভয়ানক একটা মেয়ের পেছনে ঘুরছি। সাংঘাতিক মেয়ে সে, ঘোল খাওয়াচ্ছে আমাদের সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট শুদ্ধ লোককে···ধরবই তাকে অবশ্য···কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিশ্বাস করতে পারছি না···নিজে দেখলাম···উঃ, হাওয়া হয়ে গেল." রোগীনির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করতে করতে বেরিয়ে যান তারা।

পরিপূর্ণ স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে তাকাই মেয়েটির দিকে। তলোয়ারের ফলার মত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল একরত্তি দেহ। সরল বিশ্বাসে আপনাকে সঁপে দিয়ে সে ঘুমুচ্ছে, সত্যই গভীর ঘুমে সে মগ্ন। কত সরল এরা। আবার কত কঠিন এদের প্রাণ।

অযত্নে উদ্বেগে এদের দিন কাটে, জীবন এদের কাছে খেলার জিনিষ—মূল্যবান হ'ল সংঘের কাজ, নেতার আদেশ।

এরাই বাঁচাবে দেশকে···জাগাবে জনতাকে···কিন্তু এদের বাঁচাবে কে? হায়রে দুরাশা। চোখে জল আসে···চেয়ে চেয়ে তার মুখের দিকে মনে পড়ে অজয়ের কথা। অজয়ের মত শক্তিমান স্বাস্থ্যবান কত নির্য্যাতিত ছেলেদের কথা··· অলক্ষ্যে নির্য্যাতিত তাদের জননীদের কথা।

চ'লে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মেয়েটি। কেমন যেন মমতা আসে তার ওপর। বলি, "হ্যাঁমা, নাগেলেই কি নয় আজ? মা বলে ডেকেছ, মায়ের কাছে দুদিন থেকে যাও না।"

বিনীত করুণ কণ্ঠে উত্তর করে মেয়েটি, "জিরুতে খুব ইচ্ছে করে মা! অন্ততঃ পাঁচটা দিনও একটু নিশ্চিন্তে থাকার লোভ খুবই হয়, কিন্তু পেছনে তাড়া করে ছুটছে সর্ব্বদা আই. বি, পুলিস। মাথায় চাপান আছে কাজের বোঝা. কেমন করে থাকি বলুন? নইলে বড় মিষ্টি লাগছে আপনার আশ্রয়, জীবন দাত্রী আপনি। কিন্তু সত্যই মা কাজ আছে।"

"কি কাজ তেমার বল না, মা? রামচরণ আমার অজয়ের ভাইয়ের মত। চাকর নয় ও শুধু। তুমি যেখানে বলবে, যে কাজ বলবে করে দেবে ও। কোন বাধা বিপত্তি হবে না, ঠিক বলছি।" না মা না, লোভ দেখাবেন না আপনি। নিজের মায়ের কাছে কতদিন যেতে পাইনি—হেথা হোথা পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটে। আপনাকে দেখে আমার মায়ের মুখই মনে পড়ছে। শরীরও আর বইছে না। ঢাকা থেকে আসছি আমি, দুদিন কিছু খাইনি। ওরা পেছনে তাড়া করেছে ঢাকা থেকেই। কিন্তু না মা, আবার না হয় আসব। মেদিনীপুর যেতে হবে আমাকে আজই, সেখানে তাঁরা যদি বিশেষ কিছু না চাপান তবে নিশ্চয় আপনার কাছে আসব। আপনার মহত্ব দেখে আর ঐ ছবিখানা দেখে চিনেছি আপনি কে। অজয় দত্তকে চেনেনা আমাদের দলে এমন কেউ নেই, আপনার কাছে এই বাড়ীতে থাকার লোভে জড়াবেন না মা।"

"আচ্ছা লোভ না হয় নাই দেখালাম, কিন্তু সত্যি ভেবে

দেখত বিপদ আছে কি না? বিপদ এ পথে নিত্যই, বিপদ তোমাদের পথের সাথী—জানি আমি তা। কিন্তু আজ তোমাকে পথে বেরুতে দিতে সত্যিই আমার মন চাইছে না। যে ভাবে ওরা তোমার দিকে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হল সন্দেহ ওদের যায়নি। আবার হয়ত তোমার পিছু নিতে পারে। এ পাড়ারই আসেপাশে ওৎ পেতে বসে আছে হয়ত তারা। তার চাইতে আমাকেই বুঝিয়ে দাও কোথায় পৌছে দিতে হবে তোমার কাগজ পত্র। গোটা ভারতবর্ষই বেড়িয়েছি আমি রামচরণকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার মেদিনীপুরেও যেতে পারব। ভেবে দেখ, আমার কথা যথার্থ কিনা? আজ যেমন বেঁচে বাঁচলে এমন করে আকস্মিক ভাবে এর পর রক্ষা নাও পেতে পার।

তবে হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করবে কি না? আমার একমাত্র ছেলে, সংসারের একমাত্র সম্বল আমার—তোমাদেরই মত ভাল বেসেছিল দেশকে। তার ফলে কোনও দিন শান্তি পায়নি সে। বন্দী বাঘের মত আজ ফুঁসছে সে কারাগারের খাঁচায়। বুকে অহর্নিশি জ্বলছে আমার সেই ব্যথার আগুন। অজয়ের সহধর্মী তোমরা—তোমাদের অকল্যাণ আমার জীবন থাকতে হবেনা। স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পার মা আমাকে।" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই তার মুখের পানে। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে "আপনার কথার যুক্তি আছে স্বীকার করি, মা। আমাকে সত্যিই আর বাইরে থাকতে দেবে না, এতই

পেছনে লেগেছে শয়তানের দল। শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে ওরা। কিন্তু কাজের ভার একজনকে ছেড়ে দেওয়া একেবারেই যে নীতি বিরুদ্ধ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ন্যস্ত ভার বইতে হবে—তাইত শিখেছি মা এতদিন।"

"তা হোক মা! তোমাদের নীতিযুক্তি মানতে গেলে বিপদ ডেকে আনা হবে আজ, আমার মন নিশ্চিত বলছে একথা, আমাকেও তোমাদের একজন মনে করে নিশ্চিন্তে দাও মা কাজের বোঝা বুঝিয়ে"। ইতস্ততঃ করে তবুও মেয়েটি। "জানেননা মা, কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য কত কঠোর শাস্তি আমাদের পেতে হয়। যে অবস্থায় যে প্রত্যুৎপন্নমতিতে আমায় আপনি রক্ষা করলেন আজ একথা সংঘ আমাদের ধারণাই করতে পারবে না।

তারা অহরহ পরিচয় পাচ্ছে মানুষের নানারকম শয়তানির। মানুষ কত বড় কৃতঘ্ন শয়তান হতে পারে তার ধারণা আপনারও নেই মা।

বাঙ্গালী হ'য়ে, আমাদের জাত ভাই প্রতিবেশী হ'য়ে, কি করে ছুটছে আমাদের পিছনে শয়তানের দল। আমাদেরই মত না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন তাড়া করে ফিরছে। সামান্য কয়েক টাকা মাইনে, সামান্য পদমর্য্যাদার জন্যে তারা আপনার ভাইকেও ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এই ভক্তি, এই একাগ্রতা যদি থাকত মা দেশের জন্য! দুঃখ হয় ভাবলে,

বাঙ্গালী ঘরের এরা শিক্ষিত ছেলে! চোখে স্বপ্নের জড়িমা এদেরও ছিল। দেশকে একদিন এরাও ভালবাসত—ইনটেলিজেণ্ট ছিল এরা সত্য সত্যই! ভয় হয় মা—বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করতে সত্যই ভয় হয়। অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করার কথা স্বপ্নেও ভাবছিনে। কিন্তু ঐত বলেছি নীতি বহির্ভূত কাজ হয়! তিরস্কার পেতে হবে হয়ত এর জন্য।" সান্ত্বনা দিয়ে বলি তাকে "তিরস্কার পেতে হবে না তোমাকে। কেননা মাথার ওপর তোমার উদ্যত খাঁড়া, অত্যন্ত অসুস্থ তুমি। মন বলছে আবার পথে বেরুলে তোমার বিপদ হবে এবং সে তোমার একার হবে না। এই কাগজ পত্রগুলো ধরা পড়লে অনেকের বিপদ আসবে। বাঙ্গালী গেরস্থ ঘরের বিধবা আমি, কেউ পেছু নেবে না আমাকে সন্দেহ করে। তবু, চিঠিগুলো পাঠ্য বুঝিয়ে দাও, রামচরণকে ডাকি আমি।"

মেয়েটি হঠাৎ পায়ের ধূলো মাথায় দেয়, "মাগো, নিজের মাকে মনে পড়ছে আজ আমার। বাংলা দেশে অন্ততঃ একটা মাও দেখলাম আমাদের কল্পনার মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে মিল হয়। কারো কাছে আমরা সহানুভূতি পাইনে। নিজের মাও আমাদের ঘরে রাখতে ভয় করে ফেরারী বলে।"

হঠাৎ মনে হয় নামটাত জানা হয়নি। জিজ্ঞাসা করি, তোমার নামটা মা? এতক্ষণ এসেছ কই নামত জিজ্ঞাসা করা হয়নি।"

হেসে ওঠে মেয়েটি খিলখিল করে, "ও বাবা, নাম কি আমা

এক আধটা? ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ি—নাম আছে সেখানে ইলা। বি-এ পড়ি, মাঝে মাঝে ক্লাসও করি। সত্যিকারের মায়ের দেওয়া নাম আমার বীরা। তারপর আরতি, রেখা, রীতা। কখনও খেস্তি খাঁদিও হতে হয় চতুর গোয়েন্দাদের ঠেলায়। দুর্গা-বাঈ হয়ে দিনকতক মাড়োয়ারী স্কুলে মেয়েদের গানও শিখিয়েছিলাম। আপনি আমায় বীরা বলেই ডাকবেন মা।"

ঠিকের ঝিকে রাত্রে থাকতে বলে বীরার দিন দুয়েকের মত খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে রামচরণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি সন্ধ্যের মধ্যে। কণ্টাই রোডে নেমে গরুর গাড়ী করে যেতে হয় এক ভদ্রলোকের বাড়ী—সে ভদ্রলোক আবার হাঁটিয়ে নিয়ে যান কিছুদূরের এক ভদ্র লোকের কাছে। আমাদের পরিচয় পেয়ে—সংকেত জানতে চাইলেন। শিখিয়ে দিয়েছিল বীরা, সংকেত বলায় তিনি নিয়ে চললেন গ্রামান্তরের এক জালিক পাড়ায়। রতিলাল জালিকের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে চলে যান তিনি অন্দরের দিকে। আমরা যাই রতিলালের নির্দ্দেশে—এর পর ওর কাছে, তারপর তার কাছে চলছিলাম। বিস্মিত নির্ব্বাক মনে ছেদ পড়বার আশা ছিল না যেন, বয়সটাও চল্লিশের পরে—ক্লান্ত দেহ যেন বেঁকে বসে। এমনই সময় রতিলাল বলে, "এইগো বাবুরা কে আইছেন তোমাগো কাছে—"

অভ্যর্থনার প্রত্যাশা না করেই বসে পড়ি মাটির ওপর। বীরার কাগজপত্রগুলো ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য আনে—ভ্রুক্ষেপও করে না

আমার প্রতি। মৃদুভাবে রামচরণ একবার বলে 'আমরা চলে যাব বাবু'? 'দাঁড়াও!' আবার তারা নিবিষ্ট হয়ে যায় কাগজ পত্রে। মাটীর ঘরে চ্যাটাই পেতে তাদের দেশ উদ্ধারের পরামর্শ সভা, জেলে বাড়ীর অন্দরে লুকানো সমিতি! তাতেও ভয় প্রবল পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের। হায়রে! কথপোকথনে বুঝতে পারি—তাদের এ আড্ডার সংবাদ পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশে। ক'জন লোকের উদ্দেশে জাল পেতেছে, ধরা পড়ল বলে। আজই এদের আড্ডা উঠিয়ে চলে যাবে তারা আবার কোন অনুদ্দেশের উদ্দেশে। বাসা বাঁধবে আবার কোন লক্ষ্মীছাড়ার ভাঙ্গা কুঁড়েয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গলায় যেন স্বর ফোটে। বলি—"আমরা যাব কি বাবা? আজকেরই ট্রেণ ধরতে চাই,—বীরাও তাই বলে দেছে, তবে তোমাদের যদি কোন আর কাজ থাকে, কোনও খবর যদি কোথাও পৌঁছে দিতে হয় তা আমি দিতে পারব।"

ভারি মিষ্টি কথা একটি ছেলের। কিংবা অজয় হারা আমার মিষ্টি লাগে কানে অজয়ের মত যে কোন ছেলের স্বর, বলে সে, "না মা, যথেষ্ট করেছেন। এই কাগজগুলো শুদ্ধ বীরা ধরা পড়লে আমরা সবাই যেতাম। বাঁচিয়েছেন—আমাদের সবাইকে। কিন্তু বড় ক্লান্ত আপনি, যেতে কি পারবেন এখন? অথচ জেলে-বাড়ীতে থাকি, জেলে বাড়ীতেই খাই আমরা—বিশ্রাম করতে বলিই বা কোথায়!"

উঠে প'ড়ে বলি, "না বাবা কিছু দরকার নেই।—মেয়েমানুষ,

কত উপোষ কাপাষ করি, অভ্যাস আছে কত কষ্ট দুঃখের। আর···একজন মায়ের ভাবনা ভাববার জন্যত তোমরা নও বাবা। একটা মায়ের কষ্টেত তোমরা চঞ্চল হও না। দেশব্যাপী লাঞ্ছিত নিপীড়িত মায়েদের জন্যই তোমরা জন্মেছ, আমার জন্য চিন্তা করবার কোনও দরকার নেই, বাবা। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। আর কি বলে আশীর্ব্বাদ কোরব!

ক্লান্ত হতেও অধিক ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরি—এ কী দরজা খোলা, চির পরিচিত লালপাগড়ীর ভীড় দরজায়! ভয়ে ঢুকতে পারিনে, থর থর করে পা কেঁপে যায়। ভগবান, এত কষ্টের পর এইকি পুরস্কার?

হাত ধরে নামায় রামচরণ গাড়ী হ'তে। সেই ভদ্রলোক দুজন—পেছনে তাদের বীরা।.. মুখে তার ক্ষোভের তিক্ত হাসি! জিজ্ঞাসা না করতেই বলে ওঠে—"বলিনি মা? এদের কি ভীষণ মাথা! উঃ এত বুদ্ধি, এত একাগ্রতা দেশের উন্নতিকল্পে যদি খরচ করতে এরা—কোন দিন তাহলে দেশ স্বাধীন হ'য়ে শিক্ষায় সম্পদে ভরে উঠত।

এই ভদ্রলোক—এই এইটি, আঙ্গুল দিয়ে দেখায় বীরা এক জনকে—ইনি আজ সকালে এসে কড়া নেড়ে বেশ সহজ ভাবে ডাক দেন—রামচরণ! ওরামচরণ! ভাবলাম আপনার কে আত্মীয়, ঝিকে দিয়ে বলালাম—রামচরণ আর মা বাইরে গেছেন কাজে! খোলা দোর পেয়েই ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক। বল্লেন, আমার

রিলিজের সংবাদ পাননি মা? চলে গেলেন বাড়ীথেকে—কোথায়? কি আশ্চর্য্য!

অন্তরাল থেকে বুঝলাম আপনার ছেলে। খোঁচা খোঁচা দাড়ী এক মুখ, চোখে মোটা চশমা। ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য খুব না থাকলে—ও মনে হ'ল উনি নিশ্চয় অজয় বাবু। সদ্য জেল থেকে বেরোন চেহারা—বড্ড মলিন বড্ড কাতর। মমতা হল দেখে—সামনে বেরিয়ে নমস্কার করলাম—বল্লাম্—কই, মাত কিছু বলেন নি আপনার আসার কথা। উনি—বল্লেন, "আপনার কথাত মা লেখেননি কিছু পত্রে, আপনি কে?" বল্লাম···'আমি! আমি তাঁর মেয়ে—পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন আমায় তিনি···'

বন্ধুর বাড়ীথেকে ঘুরে আসি বলে উঠে গেলেন। তারপর এই কাণ্ড। শয়তানে দেশ ছেয়ে গেছে মা, কি করবেন আপনি? কিই বা কোরব আমি, দুঃখ করবেন না মা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এরা যেরকম করে ছোটাচ্ছিল তাতে ধরাত পড়তেই হোত। মেলা হয়রাণী নাহ'য়ে এ ভালই হ'ল! বড় রক্ষা করে ছিলেন সেদিন ঐ কাগজ পত্রগুলো! ব্যস। এরাও ঠ'কে। সেদিন এরা ঠ'কেছিল, আজ আমি ঠকলাম। আচ্ছা! দেখা যাবে, আবার দেখা যাবে একদিন! আসি মা।" চোখে অন্ধকার হয়ে যায় দশদিক—আস্তে আস্তে বসে পড়ি ধূলোর ওপরেই। স্বর ফোটে না গলায়, জল ঝরে না চোখে। কোনও অনুভূতি আসে না মনে, যেন মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। ছায়ামূর্ত্তিরা সব চলে যায়

আমার সামনে দিয়ে। ওরা কারা ? ওরা কি অজয় ? ওরা কি আমার মেয়ে বীরা ? বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। আলো আছে, দাহিকা শক্তি নাই ! ওরা কারা ? সমস্ত অন্তর আমার হাহাকার করে ওঠে। একটাই শুধু প্রশ্ন জাগে—ওরা কি তবে স্বপ্ন ? একী মিথ্যে ?

শীলা

শীলার পত্র পেলাম!

গরমের ছুটিতে চারদিনের জন্যে আসছে সে আমার পল্লী-কুটিরে। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! এর চাইতে বড় দুঃসংবাদ আমার জীবনে এখনও কোন পত্র ব'য়ে আনেনি। উদ্বেগে আশঙ্কায় ঘরের সব ক'টি প্রাণীই প্রায় ঘেমে উঠলাম!

পষ্টতঃই উনি বলে উঠ্‌লেন, "এ বাপু ভারি অন্যায়। সহুরে বড়লোকদের অনেক বদখেয়াল আছে জানি। কিন্তু এ কেমন বদখেয়াল? আমরা চাষাভূষো মানুষ, দেশের এখন এই মহা দুর্দ্দিন, এখন তিনি আসছেন কবি কল্পিত পল্লীশ্রী দেখতে! ফিরে গিয়ে আমাদের মূর্খতা, অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে মস্ত আর্টিকেল লিখবেন, লেকচার দেবেন তাঁদের সোসাইটিতে। ধন্য ধন্য পড়ে যাবে তাঁর।

বেশত আছ বাপু সব। সিনেমার পল্লীচিত্র দেখ, কেমন পরিচ্ছন্ন বেশে চাষারা ধান কাটতে যায়, গান গাইতে গাইতে সেমিজ শায়া পরে চাষানীরা জল আনে, পুকুরে পুকুরে শত-দলের শোভা!

এখন এসে দেখুক মিলবে না ছবির সঙ্গে, তখন যত দোষ এই বেটাদের। এই সব হাঙ্গামা পছন্দ করিনে আমি, তোমার আর কি?"

অপরাধীর মতই বলি আস্তে আস্তে, "তা আমি কি কোরব ? আমিত তাকে কখনো আসতে লিখিনি। দেখত—সেই উপযাচক হ'য়ে পত্র দেয়, আমি উত্তরও দেই না। কবে এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি তাই ধরে ও আত্মীয়তা করে যেন মার পেটের বোন, আমার কি দোষ বল ?" "না দোষ আর কি—এখন নাও ঠেলা মার পেটের বোনের! গরীব বড়লোকে সম্বন্ধ রাখতে নেই মার পেটের বোন হ'লেও—আর এতো বন্ধুত্ব! আমি বাবা বাড়ী থাকব না—সে দুদিন," গজ গজ করেন উনি! রাগ করতে পারি না, ওঁদের রাগ হবারই কথা! লাখপতির মেয়ে শীলা... সোনা খায়, হীরে মাখে, তাকে আমি কি করে ধরাব এই জরা জীর্ণ ভেঙ্গে পড়া বাড়ীতে, দুখানা মোটে ঘরে!

কিন্তু সে আসবেই, খেয়াল যখন ধরেছে। আশুবাবুর এক মাত্র মেয়ে মাতৃহীনা সে—যা বলে, যখন যা জেদ ধরে পূর্ণ করেন তখুনি তাই। আসবেই যে সে তার কোনও ভুল নেই। উঠে পড়ে লেগে যাই। সোডা দিয়ে হ্যারিকেনের চিমনি সাফ করি, বালিসের ওয়াড়গুলো খারে সেদ্ধ করে ঘাটে নিয়ে গে আছাড় দিই, ঝুল ঝাড়ি ঘরের। যথাসাধ্য, যথাসম্ভব বাড়ীর শ্রী ফিরোতে চেষ্টা করি—দুদিনের মধ্যে যতটা পারা যায়। আমার দুঃখ দেখে রাগ ঝাল যাই করুন আপ্রাণ চেষ্টায় সহযোগিতা করেছিলেন উনিও। উঠোনের জঙ্গল কেটে, ঘাটের খেটে সরিয়ে, বাইরের ঘরের ঝাড় মোছ করিয়ে—সৌন্দর্য্য ফোটাতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না ওঁর।

ঠাকুর পো কেবল রইল ভীষণ গম্ভীর, মুখ দেখে তার বুক কাঁপছিল আমার। যা কটুভাষী আর যা মরালিষ্ট ও না, জানি অপদস্থ করবে আমায়। এই আশঙ্কায় আমার জানা শোনা যত দেব দেবী ডাকছিলাম সব্বাইকে—হে মা দুগ্‌গা—হে মা কালী—রক্ষে করো মা আমার মান। এই হয়ে পড়েছিল আমার মনের, মুখের একমাত্র বুলি। যথা সময়েই এসে প'ড়ে শীলা—অসুখ হয় না, এক্সিডেন্ট হয় না—মতি বদলায় না—ঠিক নির্দ্দিষ্ট ট্রেণে হাসিমুখে পৌঁছে যায় সে! উনি স্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন! আনন্দে উচ্ছলিত হ'য়ে জড়িয়ে ধরে আমায়—"কতদিন পরে ভাই দেখা! তুইত আমায় ভুলে থাকিস—একবারও খোঁজ নিস না, আমি কিনা বেহায়া—"

"থাক থাক—আর অভিমানে কাজ নেই চল। দেখত কত কাজ করতে হয় আমাকে, সারাদিন চিঠি পত্র কি লিখতে পারি, আয়, কাকাবাবু ভাল আছেন? ছাড়লেন যে তোকে?"

হেসে ওঠে শীলা খিল খিল করে…"ওঃ সে যদি শুনিস ভাই! জল খেও না, চান কোর না, সন্ধ্যের পর মশারিতে ঢুকে বসে থেক, বেশী খেও না, রোজ কুইনিন পিল খেও—সে মস্ত একটা লিষ্ট আছে দেখাবোখন তোকে! আসতে দেবার কি ইচ্ছে হয়—হুঁ বাব্বা, আমিও—শীলা—না আসতে দিয়ে উপায় আছে? তা ভাই আমি কিন্তু গ্রাম দেখব। পাড়ায় পাড়ায় মাঠে মাঠে ঘুরবো, নিয়ে যাবি না আমায়?" রান্না করতে হবে, শীলা আছে—রান্নার একটু বিশেষও দরকার—

বিব্রত বোধ হয়। বলি, "ঠাকুর পো—নিয়ে যাবে ভাই শীলাকে? আমার যে রান্না আছে! গুম হয়েছিল সে কদিন হ'তেই। পূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকায় একবার আমার দিকে—তার পর তাচ্ছিল্য ভরা ছোট্ট উত্তর দেয় একটু, "না সময় হবে না—কতকগুলো রুগী বসে আছে দেখে এলেত! যা হোক—জল-টলও কিছু দিতে হবেত তাদের দেখে।" ফিরে দাঁড়ায় শীলা—"কেন? জল-টল কেন? ওষুধ! ওষুধ দেবেন না?—" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে ঠাকুর পো—"ওষুধ! ওষুধ কোথা পাব? ব্ল্যাক মার্কেটে ওষুধ কিনে খাবার মত পয়সা পাড়া-গাঁয়ের লোকেদের নেই, বিলোবার মত পয়সা আমারও নেই।

যা অমনি পারি। ছাতেম, গুলঞ্চ, কালমেঘ তাই দিই। কিন্তু তাতে ম্যালেরিয়া ত যাবে না। হতভাগারা ও ছাড়ে না—দেখুন না পালে পালে আসছে—"

"ঠাকুর পো অমনিই বে! বড় রুক্ষ ভাষী, কিন্তু বড় উদার। ডাক্তারী পাস করে দেখ প'ড়ে আছে এই গাঁয়ে, একটা পয়সা পায় না—বরং ঘরের পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করে।

তাএক কাজ কর। আমার এই খোকার মাকে নিয়ে এই পুকুর ধারটার ঘুরে আয়। যাওত—খোকার মা—মাসীমাকে—একটু বেড়িয়ে আনো। বাটনাটুকুক তুলে নেবখন আমি। কি আর দেখবি ভাই—দেশ গেল আস্তে আস্তে।"

শীলাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রান্নাঘরে ঢুকি। বড়লোক-হোক, যাই হোক—মনটা ওর বড় ভাল! আহা আসবে

বলে বাড়ীশুদ্ধু কত কটু কাটব্যই না করেছি। মনটায় অনুতাপ আসে।

(২)

রান্না প্রায় শেষ হ'বো হ'বো। পোলাওয়ের হাঁড়িটা খানিকটা আগুন কেটে বসিয়ে রাখতে যা বাকী, সাড়া পাওয়া যায় শীলার। খোকার মা বলে, "মাসীমা বাইরের ঘরে ঢোকলেন মা ঠাকরুন।' তাড়াতাড়ি যাই হলুদের হাতটা কাপড়েই মুছতে মুছতে—দেরী করি না—গামছা খুঁজে। কি জানি ঠাকুর পো কি বলে ফেলবে—শীলাই বা কি বলে বসে।

যা ভেবেছি তাই! ঘরে ঢুকেই সোজা প্রশ্ন করে শীলা ওকে—"আচ্ছা সুরথ বাবু! আপনারা কি মানুষ!"—রোগী দেখছিল ঠাকুর পো। চমকে তাকায় মাত্র, আবার মনোনিবেশ করে আপনার কাজে। বুঝতে পারি—ভোলা রইল ওর উত্তর।

উনি বেশ ধীরে সুস্থে-নাকে, কানে, চোখে হাত বুলিয়ে উত্তর করেন, "হ্যাঁ! মানুষ বলেইত মনে হ'চ্ছে! কেন আপনার কিছু সন্দেহ আছে নাকি?" হেসে উঠি সব্বাই—"নানা, তামাসা নয়! সত্যিই—গ্রাম বেড়িয়ে একথাটা বড্ড মনে হ'ল। মনুষ্যত্ব আপনাদের সত্যিই নেই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উনি উত্তর করেন ধীরে ধীরে, "দেখুন শীলা দেবী! আপনার কথাগুলো প্রথম প্রথম-এসে গাঁয়ের লোককে আমিও বলেছিলাম। কিছু দিন পরে সব ঠাণ্ডা,

মানুষ কেই বা আছে সংসারে বলুন ত?" আপনার, আমার, এর ওর কারোই মনুষ্যত্ব নেই—বুঝলেন ?"

ওঁকে ঠেলে পাঠাই স্নান করতে, অল্পেতে চ'লে যাওয়ায় নিশ্চিন্তও হই—কিন্তু সর্ব্বনাশ বাধায় ঠাকুর পো। রক্ত চক্ষু ফিরিয়ে শীলার দিকে প্রশ্ন কল্লে—"হুঁ তখন রুগী দেখছিলাম। বলুন ত হঠাৎ আমাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হল কেন আপনার মনে? কিসে দেখলেন অমনুষ্যত্বের পরিচয় ?"

আমার শরীর হিম হয়ে ওঠে—সদম্ভে শীলা উত্তর দেয়; "বলব নিশ্চয়ই! আপনি ডাক্তার, আপনার দাদা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, গাঁয়ে যে এমন মহামারী হ'চ্ছে তার কোন উপায়—মানে প্রতিকার করেন কি আপনারা? আপনারা শিক্ষিত! আপনারাই যদি প্রতিবেশী সম্বন্ধে অতটা 'কেয়ার লেস্' হ'ন, তবে মূর্খ যারা তারাত হবেই, আপনাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবার এই কি যথেষ্ট কারণ নয় ?"

বাঁকা একটু হাসি হাসে ঠাকুর পো—"অল্‌রাইট! মনুষ্যত্ব আপনার নিশ্চয় আছে? কিন্তু আমার এই রোগিণী বুড়ি মা যখন কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন অমন চমকে গেছলেন কেন বলুন ত? বুড়ী বলে? রোগী বলে! নোংরা বলে মানুষকে যারা ঘৃণা করে তারা যাচাই করতে আসে অপরের মনুষ্যত্ব আছে কি না? লম্বা লম্বা কথা বললে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হয় না। মনুষ্যত্বের পরিচায়ক কি কাজ করেছেন আজ পর্য্যন্ত ?

"কি হ'চ্ছে ঠাকুর পো। সব সময় মাথা গরম—যেন দুর্ব্বাসামুনি—আয় ভাই শীলা, ওর সঙ্গে ঝগড়া বকতে হবে না। চানটান করবি—" তরল করতে যাই অবস্থাটা। কিন্তু বাবাঃ—বোমার মত ফেটে পড়ে শীলা—"বেশ! আমার ঘাট হ'য়েছে স্বীকার কচ্ছি! কিন্তু আপনিই বা কি কম লম্বা লেকচার ঝাড়লেন? আপনার দাদাও কম যান না—বড় বড় প্রবন্ধ ঝাড়েন বড় লোকদের গালি দিয়ে। কাজ কতটুকু করেন আপনারা তাইই না হয় বলুন! ফেটে মরে যাচ্ছেন ত বড়-লোকের হিংসেয়—"

সোজা হয়ে দাঁড়ায় ঠাকুর পো—হাতের আস্তিনটা গোটায়। হেসে পরিহাস করতে যাই—

'বাপরে! মারামারি বাধাবে নাকি? আস্তিন গোটাচ্ছ যে!' হাসিটা বেমানান হ'য়ে যায়। আবহাওয়া এত গরম! "হিংসে আমরা করিনে, জানেন! হিংসা, ঘৃণা বিদ্রূপ এগুলো গরীবের অভিধানে নেই—বড়লোকরাই হ'য়ে থাকে পরশ্রী-কাতর। ন্যাষ্টি বলে নাকে রুমাল চাপা বড়লোকেরাই দেয়! আজ একে বুড়ী বলে ঘৃণা করে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু জানেন—ওর একমাত্র ছেলে যুদ্ধে গিয়ে মরে যাবার পর দাদাই ওর সংসার চালাচ্ছেন? অথচ পাঁচটা টাকার জন্যে বৌদি একখানা কাপড় কিনতে পারে না—তালি দিয়ে রিপু করে নেকড়া পরছে। পারেন আপনারা? মনুষ্যত্ব যদি কিছু থাকেত আমাদেরই আছে। আপনাদের? ফুঃ—জানেন খেতে পরতে বেড়াতে।

বড়লোকদের আমরা ঘৃণা করি না, হিংসা করি না—করুণা করি। বড় অপদার্থ অভাগ্য জীব তারা। যান যান, দেরী হ'য়ে গেল আমার। এখনও হতভাগাগুলো বসে আছে—নে চলরে সাধু—কোথায় তোর জামাই বাড়ী নিয়ে যাবি। তোমরা খেও বৌদি, মহামান্য অতিথি আছেন—ওঁকে খাইও। আমার ভাগ্যে আজ আর জুটবে না হয়ত! হ্যাঁ, দেখো, দাদাকে গপ গপ করে এক গাদা ডাল ভাত খেতে বারণ কোরো ওঁর সামনে—মূর্চ্ছা-টুর্চ্ছা যেতে পারেন হয়ত দাদার খাওয়া দেখলে।"

শীলাকে টেনেনিয়ে যাই ভেতরে—শীলার রাগ হবে কি—অপমানে রাগে কাঁপছিল আমারও দেহ। বাড়ীতে এসেছে! অতিথি, তার ওপর এমনি ব্যবহার! তোমরা পরোপকারী ভালো লোক আছ থাক, তা বলে মানুষকে এত কড়া কথা শোনাবে?

শীলার স্তব্ধ গম্ভীর মুখের প্রতি তাকিয়ে বড্ড মমতা হয় "রাগ করিস না শীলা! ঠাকুরপোর ব্যবহার যদিও অভদ্র তবু এইটুকুই বলছি ভাই, অতটা অভদ্র ও নয়, আমার জন্যও তুই ক্ষমা করিস ওকে।"

ধীরে ধীরে বলে শীলা, "ভুল বুঝিস না সবিতা। রাগ আমি সত্যিই করিনি। সনৎ বাবুর কথা শুনে পল্লীর অবস্থা সত্যিই বুঝতে পাচ্ছি আমি। বড়লোকেরা বড় বড় কথা বলে, কাজ করে না—এতো সত্যি কথাই উনি বলেছেন। আমার বড় ভুল আজ ভাঙ্গল ভাই, রাগ করি নি। রাগ করিনি

বল্লেও বেশ বুঝতে পারি রাগই সে করেছে। খেতে বসে যখন সে প্রস্তাব তোলে, 'আজই যাব ভাই, স্বপ্নথ বাবুকে বলে ব্যবস্থা করেদে'। চমকে উঠি—"সেকি! দুদিন থাকবি বলে এসেছিস, রাগ করে চলে যাবি! তুই বিশ্বাস কর শীলা—ঠাকুরপোর অন্তরের কথা ওই হ'লেও তোকে বিঁধবার জন্যে তা বলে নি, সবাইকেই অমনি রূঢ় কথা বলে ও। কিন্তু অন্তরটা গঙ্গা-জলের মত সাদা। গরীব দুঃখীদের ওপর বড্ড টান ওর। তুই ক্ষমা কর ভাই!" একটুখানি হেসে বলে ও—"তোর মাথায় ওই রাগ ভূত ঢুকেছে—সবিতা! রাগ আমি সত্যিই করিনি। আবার আসব, একটা কথা ভাবছি মনে মনে। বলতে এখন পার্চ্ছিনা তা, তাই বলছি ভাই আসবই আমি, ভুল বুঝিস না তুই।"

উনি কথা কননা একটাও। ঠাকুরপো বাড়ী ফিরে চমকে ওঠে—"ব্যাগট্যাগ বাঁধা দেখচি, চললেন নাকি বৌদি তোমার বান্ধবী?" ভারি দুঃখ হ'চ্ছিল। বেচারী এলো এত আশা করে, পায় পায় চলে যেতে হ'ল তাকে। খোঁচা না দিয়ে পারি না। "হ্যাঁ যাচ্ছে বৈকি! তোমাদের অভদ্র ব্যবহারে এখানে থাকার স্পৃহা আমারই চলে যাচ্ছে তার—ওত পর। ছিঃ ছিঃ—ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলতেও শেখনি তোমরা।" লজ্জা হ'তে দায় প'ড়ছে! বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠেই জবাব দেয় ঠাকুরপো—"ভারি দুঃখিত বৌদি! ব্যাথা পেয়ে তোমার বান্ধবীটি চলে যাচ্ছেন বলে। কি কোরব? আমরা গেঁয়ো লোক, বুঝে সুঝে

কথা বলা ধাতে আসে না। তা তুমি ভেব না বৌদি—ওঁর এ দুঃখস্মৃতি দুএক ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হবে না। যেখানে অবাধ আনন্দের আবহাওয়া, সেই হাই-সোসাইটিতে গিয়ে পড়লে—সব ভুলে যাবেন।" চোখের জলে বিদায় দিলাম শীলাকে—সত্যি বড় দুঃখ বাজল মনে, এমন দুর্ব্যবহার ওরা কেন কোরল বুঝতেই পারলাম না অনেক ভেবে—

যাবার বেলায় আর একবার বলে গেল শীলা…"ভুল বুঝোনা ভাই। আবার আসব—তাই এত শীগগীর যাচ্ছি… আশীর্ব্বাদ কর যেন আবার আসতেই পারি।"—

সত্যই আসে শীলা! খবর দিয়ে জল্পনা কল্পনার অবসর দিয়ে নয়, হঠাৎ একদিন।

আশ্চর্য্য হই সরল অনাড়ম্বর বেশভুষা দেখে। আরও আশ্চর্য্য করে দেয় সে আমাকে প্রণাম করে…

"এ আবার কিরে? প্রণাম করছিস যে বড়!" বুকে জড়িয়ে ধরি তাকে। "আজ আর বন্ধু নয়! আজ বোনের মর্য্যাদা চাইতে এসেছি ভাই। তোমার কাছে থাকবার ভিক্ষা দিতে হবে" মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয় শীলা। দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীর মত মনে হয় তার কথাগুলো, ভাবভঙ্গী। চঞ্চলা শীলা হ'য়ে গেছে হঠাৎ স্থিরা। চলনে বলনে কেমন যেন একটা সংযত ভাব। বুঝতে পারি না কিছুই—আবার বলে সে, "এখনও বুঝতে পারছ না ভাই? আরও কি বলতে হবে? বাবার মত নিয়ে তোমাদের আশীর্ব্বাদ চাইতে এসেছি। এর জন্য যা কিছু করতে বল আমি

প্রস্তুত! চল আগে যাই যেখানে গা'ল খাবার ভয় বড় বেশী, সুরথ বাবুকে কিন্তু আমি মুখফুটে কিছু বলতে পারব না। সন্ধ্যে বেলা বাবা আসছেন"...

আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যাই! দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরি শীলাকে প্রবল আবেগে—"সত্যি শীলা সত্যি? ঠাকুর-পোকে তুই বিয়ে করবি? সুখী হবি ভাই অশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি—প্রণাম করে যখন গুরুত্ব দিলি কায় মনে আশীর্ব্বাদ করি—তুই সুখী হবি। ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোর মাথায় অজস্র ধারে পড়বে,"—বলতে পারি না। ভাষা জোগায় না মুখে।

"এত উচ্ছ্বাস কাকে নিয়ে বৌদি! ওঃ আপনি! আবার এসেছেন? চোখা চোখা বাণ এনেছেন অনেকগুলো নিশ্চয়?" হাসিমুখে ঘরে ঢোকে ঠাকুরপো—"এ হে-হে, একী করছেন সর্ব্বনাশ! প্রণাম করলেন কেন? সেকহ্যাণ্ড করুন, জানি আমি।' প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় শীলা, বেরিয়ে পড়ি আমি ঘর থেকে। "নাও বাপু, বোঝাপড়া তোমরাই কর, তৃতীয় ব্যক্তি এখানে না থাকাই ভাল। রান্না বান্নার জোগাড় দেখতে হবেত।"

কিন্তু পারিনে, একটু শুনতে ইচ্ছে যায় শীলার কেরদানীটা। দেখবার লোভ সামলান দায় হয়। কেরদানীই বটে! ঠাকুর-পোকে হজম করা সোজা নয়। ঝুনো নারিকেলের মত ওর ওপরটা কঠিন, সংস্কৃত কাব্যের মতই আগে দুর্বোধ্য, বুঝলে মিষ্টিও। আস্তে আস্তে বলে শীলা, "সেদিন বড্ড ভাল লেগে-

ছিল আপনার কাছে কঠোর সত্যি কথা কতকগুলো শুনে। তাই আবার এসেছি। জানি আমার এ ইচ্ছাকেও বিদ্রূপ করবেন আপনি, তা করুন, কিন্তু ফিরিয়ে দেবেন না আমায়। তিরস্কারে তিরস্কারে আমার মনকে খাঁটি করে নিন।—সহকর্ম্মিণী করবার যোগ্য করে নিন আপনি।"

বিদ্রূপের ত গোড়াই মেরে রাখলেন! বিদ্রূপ করা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—হঠাৎ এমন দুর্ম্মতি হ'ল কেন আপনার? আর অভিভাবকই বা কেমন আপনার? যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে সহকর্ম্মিণী হব বল্লেন আর ছেড়ে দিলেন?" দুর্ম্মতি! দুর্ম্মতি নয় তা আপনি নিশ্চয় জানেন। কেন হ'ল, বলেছি ত বড্ড ভাল লেগেছে আপনার কাছে পাওয়া সে দিন-কার তিরস্কারগুলো···শুধু রিক্ত হ'য়েই নিজেকে নিবেদন করতে এসেছি! বিদ্যার দম্ভ, ধনের গর্ব্ব নিয়ে নয়। আর বাবা! বাবা সত্যিই ভালো। আমাকে ঘিরেই তাঁর সম্পদ সঞ্চয়। আমি সুখী হ'লেই তিনি সুখী হবেন, কাজেই মন মতো স্বামী বরণে তিনি বাধা দেবেন কেন? আশীর্ব্বাদই করতে আসছেন তিনি।"

"হুঁ, সব ঠিক ঠাক! ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার দম্ভ নয়ত তবে কি এ? ভেবেছ তুমি ইচ্ছে কর্ল্লে আর লুপ লুপ করে আমি ছুটে গেলাম? পাগল নাকি! তুমি যাও বাবা, আজই পথ দেখ! আমার মত অনেক ডাক্তার জুটবে তোমার রূপ গুণের গন্ধে। আমাকে কেন আর জড়াচ্ছ"···"আপনি যাই বলুন আমাকে

দূর করতে পারবেন না। গ্রহণ করুন বা না করুন নিবেদিত আমি হ'য়েই গেছি। রাগ করবেন না আপনি! মিনতি করছি, আমায় পরীক্ষা করে দেখুন।"

"বেশ! সেই ভাল! কিন্তু পরীক্ষা দিতে চাইছ যে পারবে তুমি? যখন ঘাট থেকে জল তুলতে হবে···যখন কাপড় সেদ্ধ করে কেচে পরতে হবে, যখন ভিজে কাঠ ঠেলে রাঁধতে হবে তখন?

তার পরও! খাওয়া এবং পরা আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কাজের জন্য জীবন। সে জীবন বাঁচাতে হোলে খাদ্যের প্রয়োজন, তাইই খাদ্যের আয়োজন! আসল যা কাজ। যেতে হবে আমার সঙ্গে কলেরা রোগীর সেবা করতে, যেতে হবে বসন্ত হ'লে সেখানে। টাইফয়েড রোগীর কাছে পালা করে রাত জাগতে হবে। পারবে?"

"পারব! না পারিত তিরস্কারে শিখিয়ে দিও তুমি! তাহলে ত ভুল হবে না?" মৃদুকণ্ঠে উত্তর করে শীলা! "দুঃখে কিন্তু পিছিয়ে গেলে চলবে না। বলে দিচ্ছি তা এখন থেকে।"

হাসি আসে আমার অন্তরাল থেকে। যেন মৌচাক ভাঙ্গতে যাওয়া কিংবা রাত্রে চুরি করতে বেরোনো জ'টে বুড়ীর আম বাগান হ'তে কাঁচামিঠে আম। "দেখো ভাই, আমায় যেন ফেলে এসো না।"

কানে আসে আবার ওদের কথা, "আচ্ছা তোমার বাবার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হবে? যদিও অনধিকার, তবু জিজ্ঞাসা

করছি। তুমিত একমাত্র মেয়ে?” উত্তর করে শীলা…সম্পত্তি অবশ্য যৌতুক বলেই লেখা পড়া করেছেন বাবা! তবে ক্রোড়-পত্রে লেখা আছে…তা দিয়ে এই গ্রামে স্কুল, হাসপাতাল, সূতিকাগার এই সবই হবে।

তুমি আমি তার ব্যবস্থাপনা কর্ত্তে পারব শুধু। বিশ্বাস করো তুমি আমায়। আমি হঠাৎ খেয়ালে এমন কথা বলছি না। কাতর হ'য়ে ওঠে শীলার কণ্ঠ—“তবে যদি কোনও দিন কোনও মোহ আসে, অন্যায় করতে যদি মন যায়…তবে তুমি আমার সে মোহ দুর্ব্বলতা দূর করে দিও।”

“শীলা! শীলা! আমিও দেবতা নই, মোহ দুর্ব্বলতা আমারও আছে। আজই মনে হচ্ছে, তোমাকে নিয়ে বসে গল্প করি। এতক্ষণ করছিলাম ছলনা করে রূঢ়তার অভিনয়। কিন্তু শীলা, মোহ দুর্ব্বলতা এলে আমাকেও তুমি রক্ষা করো। বড় দুঃখী আমার দেশের লোকেরা…তাদের ভুলে যেতে দিও না তুমি। আমার জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আমার গ্রামের উন্নতি করা....সে পথ চ্যুত করো না যেন তুমি।” রুদ্ধ কণ্ঠ স্নেহে গাঢ় হয়ে ওঠে ঠাকুরপোর…

শীলা আবার নত হয় তার পায়ের কাছে। অলক্ষ্যে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করি আমি অন্তরীক্ষে…ঈশ্বর।

বিপাশা

দুঃখের বোঝা যখন বড্ড গুরুভার হয়ে উঠেছে, ভাবছে যখন নর্ম্মদা কেমন করে···কোন পথে দেবে অসীমকে মুক্তি, তেমনি সময় আসে বিপাশা···আবাল্য বান্ধবী নর্ম্মদার।

বাড়ীওয়ালার কঠোর মন্তব্য কতকগুলো হজম করে বসে আছে অসীম গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে, মায়ের রুক্ষ মনের উষ্ণপ্রকাশস্বরূপ দুটো কিল খেয়ে কাঁদছে যখন ত্রিবেণী, কিছুই না বুঝে কি একটা ঘটে গেছে বুঝে হক চকিয়ে এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে যখন ত্রিবেণীর ভাইটি, ভাবছে যখন নর্ম্মদা, 'গলায় দড়ি দেবে? ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে, ছেলে মেয়ে দুটোকে বিষ খাইয়ে দেবে কি? কেমন করে কি উপায়ে দেবে সে অসীমকে মুক্তি!

সদা সুন্দর সদা প্রফুল্ল অসীমের দেহে এসে গেছে অকাল বার্দ্ধক্য, হাসি পালিয়েছে···যেমন করে দেশের সুখ সাচ্ছন্দ্য উধাও হয়েছে তেমনি করেই, অসীমের হাসিমুখ দেখবার কোনও উপায়ই খুঁজে পায় না নর্ম্মদা। বোঝে ফাঁসীর দড়ির মতই তাদের ভাবনা এঁটে বসেছে অসীমের গলায়—রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার শ্বাস।

মাসের অর্দ্ধেক দিন রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়াতে পারলে সংগ্রহ করা যায় নুন ভাতের মত কিছু জিনিষ। কিন্তু দাঁড়াবে কেমন করে অসীম? নুন ভাতের আসল প্রশ্নত লাইন নয়... লাইন দিয়ে, ভিজে পুড়ে যা আনতে হয় তাতো ভিক্ষে নয়··· তার জন্যে চাই অনেকগুলো টাকা। অফিসে কামাইত কামাই বড়বাবু চোখ রাঙ্গিয়ে ফাইন করেন সামান্য দেরী হলে। ট্রামে উঠতে নাই পার, ঝুলেই যাও গড়িয়েই পড়, একচুল লেট হবার যো নেই, কামাই হলে একদম চাকরী যাবে তা বলে দেছেন পষ্ট। চাকরীতে লোক ছাঁটাইয়ের যা একটা হুজুক পড়েছে, বড় ভয়ে সন্তর্পণে দিন কাটাতে হয় অসীমকে।

লাইনে দাঁড়িয়ে কয়লার ঝুড়ি হাতে ভিজে পুড়ে ত্রিবেণীই যোগাড় করে কয়লা, ভিখারীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেশনের মস্ত লাইন শেষে আনে সেই দুটো চাল, পাশের ঘরের ভাড়াটে ছেলেটিও দয়া করে সাহায্য করে অনেক সময়। কাপড়! কাপড় পরবার সখ গরীব কেরাণীদের পরিবারের না থাকাই ভাল, কিন্তু দেশে এখনও নারীর উলঙ্গতা লোকের চোখ সহা হয়নি। তাই মাঝে মাঝে আত্মহত্যার সংবাদ শোনা যায়···বস্ত্রাভাবে, না শোনা আরও কত আছে। তিল তিল করে হত্যা ত নিত্যই দেখা যায়।

ভাল দু' একখানা শান্তিপুরে সাড়ী ছিল নর্ম্মদার, তাই পরে চালিয়েছে একটা বছর। লাইনে দাঁড়িয়ে অসীম যা যোগাড় করতে পেরেছে তাতে কুলোয়নি অসীমেরই। কিন্তু আর যে চলে না!

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার কথা আর গল্প নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে নর্ম্মদা…চলে না আর। এদিকটা ঢাকতে গেলে ওদিকটা আলগা হ'য়ে যায়। ভাড়াটে সমাকুল বাড়ীর কলতলায় এক বালতি জলের জন্য লড়াই করবার মত আব্রু রক্ষা করা চলে না আর শতছিন্ন সাড়ীগুলো দিয়ে। শুধু নর্ম্মদার নয়, সব মানুষেরই আজ এক দশা। অবিচারী লোভাতুর চোরাকারবারীদের, তাদের পৃষ্ঠপোষক শাসকদের হাত হ'তে মুক্তি মাগে প্রত্যেক মানুষেরই জীবন দেবতা।

কিন্তু হয় না, মুক্তি মেলে না! অভাব অবিচার হ'তে কোথাও কোন পরিত্রাণ পাবার আশাও দেখা যায় না, মানুষের রুদ্ধ আক্রোশ, অভাব অসাচ্ছন্দ্যের জ্বালা উৎসারিত হয় আপনারি পারিপার্শ্বিকে, তাইই আজ মানুষে মানুষে এত হানাহানি, রেষারেষি। দয়া—ধর্ম্ম, পরোপকার কথাগুলো উঠেই গেছে মানুষের অভিধান হ'তে, মনেও প'ড়ে না আর সে কথা-গুলো! কেমন করে পড়বে? কখন পড়বে? ভদ্র, শিক্ষিত মানুষে মানুষে প'ড়ে যায় কুকুরের মত কাড়াকাড়ি একটুকরো কয়লা নিয়ে, রেশনের দোকানে আগে দাঁড়ান নিয়ে।

হঠাৎ যেন বিংশ শতাব্দীর মানুষ চলে গেছে সেই উলঙ্গ বর্ব্বরতার যুগে, দেহে ভদ্রতার আচ্ছাদন রইলেও অন্তরে উঁকি দিচ্ছে সেই আদিম বর্ব্বরতা, জানোয়ারের মনেও যেটুকু স্বজাতি প্রীতি আছে—তা নেই আজকের বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। নর্ম্মদার হৃদয় মুক্তি মাগে! অন্তরের ভগবান

তার বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে। সত্যই সে ভাবে···বিষ খাবে কি? বিষ? বিষই বা পাবে কোথায়? আফিম কিনতে গেলেও ত লম্বা লাইন! গলায় দড়ি দেবে সে! অসীমকে মুক্তি দিতেই হবে, না হ'লে অসীম বাঁচবে না। সে চিন্তা সইতে পারে না নর্ম্মদা।

ঘুট ঘুট করে কড়াটা ন'ড়ে ওঠে। চোখ মুছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ত্রিবেণী—খুলব।

"খোলতো! হয়ত বাড়ীওয়ালাই এসেছে আবার—কি বলবে কে জানে। যাও খোলগে—কি আর করবে"—অনুমতি দেয় নর্ম্মদা—"বাড়ীওয়ালা! ঘরওয়ালা বল—কিংবা গোয়ালওয়ালাও বলতে পার"—ব্যঙ্গ করে ওঠে অসীম। হকচকিয়ে দাঁড়ায় ত্রিবেণী—বাড়ীওয়ালা নয়, ভদ্র মহিলা একজন, জিজ্ঞাসা করেন "নর্ম্মদা এখানে থাকেত? তুমিই না ত্রিবেণী? সেই কতটুকুন দেখে গেছি। আমায় চেন? আমি মাসীমা—জেলে ছিলাম।"

জলভরা চোখে হাসি ঝিকমিক করে ওঠে—পায়ের ধুলো নেয় ত্রিবেণী—"হ্যাঁ এবার চিনতে পেরেছি—বিপাশা মাসীমা আপনি, তাইত? মা খুব বলে আপনার কথা—"

"আমার বুড়ীমা"···চিবুক ধরে নাড়া দেয় বিপাশা, চল মায়ের কাছে যাই"—ঘরে ঢুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বিপাশা নর্ম্মদাকে—"আজই রিলিজ হ'ল ভাই, তোর জন্যে বড় মনটা কেমন করছিল কদিন, তাই—আগেই তোর কাছে এলাম—

সন্ধ্যে বেলা বাড়ী যাব। অসীম বাবু ভালত? অত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" অসীমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে বিপাশা। উত্তর দেয়না অসীম। তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে শুধু শুখনো মুখে তার! নর্ম্মদার দুচোখ ছাপিয়ে জল ঝরে প'ড়ে ঝরঝর করে, বান্ধবীর স্নেহের পরশ নাড়া দেয় তার রুদ্ধ বেদনায়। আশ্চর্য্য হ'য়ে আবার প্রশ্ন করে বিপাশা—"কি হ'লো ভাই নর্ম্মদা, ত্রিবেণীর কচি মুখেও বিমর্ষ ভাব—তোরা কথা বলছিসনা—ঝগড়া করেছিস নাকি দুজনে?" "ঝগড়া?" তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে অসীম, "ঝগড়া করা ভাব করা ওসব কাব্য, পেটে ভাত থাকলে কাব্য আসে, ভাব, ঝগড়া, আদর, অনাদরের প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। সখের জেল খাটেন আপনারা, গভর্ণমেণ্টের পয়সায় খান—বুঝবেন কেমন করে অবস্থা কোথায় ঠেকেছে, আপনাদের মত দুমাস ছমাসের জেল আমাদের নয়, আমরণ কণ্ট্রাক্ট—মুক্তির কোনও আশা নেই—উঠ্‌তেই পারেনা মুক্তির প্রশ্ন।" দুহাতে মুখ ঢাকে অসীম, বোধ হয় পুরুষের দৌর্ব্বল্য চোখের জল ঢাকতে, নর্ম্মদা বিপাশার হাত ধ'রে টানে, "আয় ভাই। কতদিন পরে এলি—অভ্যর্থনা বেশ ভালই হল, চল বাইরে বসি, ওঁর মনটা ভাল নেই আজ—আয়—"

বাইরে বসতে চায় নর্ম্মদা! গাড়ী-বারান্দা বা অন্ততঃ সরু একখানি বারান্দাও নয়, সিঁড়ির নীচে কলতলার গায়ে একফালি র'ক। রান্নার উনুন-হাঁড়ি-কড়া সেইখানেই থাকে, বৃষ্টির দিনে রান্না করা যায়না—ঘরের মধ্যেই সে পাট চুকিয়ে নিতে

হয় । একখানা পিঁড়ে পেতে বসায় নর্ম্মদা বান্ধবীকে !

"তুইত ভাই আগস্ট হাঙ্গামায় জেলে গিয়ে বাঁচলি—আর সেই হ'তে দুর্ভিক্ষ মহামারী হ'ল ব্যাপক—আজও তার জের টেনে চলছি ভাই, আর চলেনা, কোনমতেই পারিনা আর ।"

"চালাতেই হবে যে ভাই ! ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। আজকের দিনেইত মেয়েদের সত্যকার পরীক্ষা। শত দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে জয় করে—স্বামীর হাত ধরে চলবার এই যুগকে ব্যথা বিভীষিকা বলে নিসনা নর্ম্মদা, এ দুঃখ-রাত্রির পরে সুখের উষা আসবেই—।" সান্ত্বনা দেয়—বিপাশা। ক্ষোভের হাসি ফুটে ওঠে নর্ম্মদার মুখে—"তুই বুঝবিনা বিপাশা, বিয়ে করিস নি—সন্তান নেই, এ-দুঃখের ধারণা করতে পারিসনা তুই। বড় বড় কথাগুলো ও একদিন আমিও বলতাম—ও শুধু বলারই জন্যে। সাহিত্যিক ভাষা ও।" দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করে বিপাশা, "বলারই জন্যে নয় নর্ম্মদা, হাতে কলমে করবার কথা, একথা শুধু কথাই রইবেনা—কাজে হবে একথা। নারী শুধু ঘরে বসে দীর্ঘশ্বাস হাহুতাশ করবেনা, পথের ধুলোয় স্বামীর সঙ্গে চেষ্টা করে ফিরবে প্রাণ ধারণের উপকরণ, নারীর চেতনা আসবে এই লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই।"

অধৈর্য্য কণ্ঠে নর্ম্মদা বলে, "শুনবনা তোর লম্বা লম্বা কথা, বড় বড় কথা ! দুদিন উপোষ করে আছি আমি। ওকে অফিস যেতে হবে আজ খালি-পেটে, খানিকটা চা পাতা সেদ্ধ জল গুড় গুলে ছেলে মেয়ে দুটোকে দিয়েছে, ঘরে কয়লা

নেই, লাইনে দাঁড়িয়ে জলে ভিজে শুধু শুধু ফিরে এসেছে কাল ত্রিবেণী। মুঠোখানিক চা'ল যা আছে ফুটোবার কোনও উপায় করে উঠ্‌তে পারলাম না আজ, এতে যে কত বড় দুঃখ তা তুই বুঝবিনা, ঘর ত কখনও বাঁধিসনি।" কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নর্ম্মদা, স্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসে থাকে বিপাশা।

কিছুটা সময় কাঁদতে দিয়ে উঠে যায় বিপাশা, "একটাকার মূড়ী আনুনত অসীম বাবু। জেলে আজ কিছু খেতে দেয় নি, টাকাটা দিয়ে বলেছে, কিনে খাবেন বাইরে।"

রক্ত রাঙ্গা চোখ তুলে তাকায় অসীম, "তাই ভিক্ষে দিতে এসেছেন আমাদের? রাস্তায় যান—অনেক দুঃখী আছে দুটো ভাতের জন্য সন্তান বিক্রী সতীত্ব বিক্রী করে, তেমন নমুনা ঢের দেখতে পাবেন, এখানে এখনও তেমন অবস্থা মোটেই হয়নি, যান রাস্তায় যান।" আঙ্গুল তুলে পথ-নির্দ্দেশ করে—মুহূর্ত্ত দাঁড়ায় বিপাশা—তারপর বেরিয়েই যায় চঞ্চল পায়ে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে জামাকাপড়ের সন্ধান করে অসীম। "রাজনীতির চর্চ্চা করতে এসেছেন এখানে! আরে! পেটের দায়ে দেশের অবস্থা কণ্ঠাগত ওষ্ঠাগত যখন, শিক্ষা, সম্মান যখন সব গেছে—মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছেচে যে দেশ—সে দেশে আবার রাজনীতি!" গজগজ করে অসীম আপন মনে। "আনলাম আমিই কিনে। ভাবছিলেন বড্ড জব্দ করেছেন না?" চমকে মুখ ফেরায় অসীম, মস্ত একটা মুড়ীর ঠোঙ্গা হাতে বিপাশা।

সহানুভূতি, স্নেহ ভরা কণ্ঠে সে অসীমের হাত ধরে "দুটি মুখে না দিয়ে বেরুতে পাবেন না অসীম বাবু! এমনিইত— মরছে দেশ—একটু হাতপা ছুড়ে মরায় দোষ কি? রাজ নীতির চর্চ্চা বলে রাগ করছেন। কিন্তু এইত সময়। দুঃখের দাহনে দেশ জ্বলে পুড়ে খাঁটি হয়ে গেছে—এবার আসবে নিশ্চয় সুদিন, সেই আশায় মানুষকে বাঁচতে হবে সুদিন আসবেই—এই আমাদের বাঁচবার মন্ত্র হতাশা এলে যে বাঁচার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। যাকগে আসুন ত দুটো মুড়ী মুখে দেবেন।"

সহজ সরল আবেদন অসীম উপেক্ষা করতে পারে না— দুটো মুড়ী মুখে দিয়েই বেরুতে হয়। ছেলে মেয়েদের খেতে দিয়ে দুই বান্ধবী মুড়ী নিয়ে বসে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য।

"দেখ নর্ম্মদা! তুই অসীম বাবু দুজনেই বললি দুঃখের বার্ত্তা আমার জানা নেই, সখের রাজনীতি করি, সুখের জেল খাটি। সত্যিই তোর দারিদ্র্য দেখে বুঝতে পারছি কত বড় নিপীড়ন এ, কত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'চ্ছে তোদের। কিন্তু জানিস না ভাই দেখতে পাওয়া যায় না শোনাবারও স্বাধীনতা নেই, কত অসহ্য পীড়ন নির্জ্জন কারাগারে—বিনা অপরাধে রাজবন্দীরা, বিপ্লবীরা পাচ্ছে—পেয়েছে, বলবি হয়ত যে ও সখ করে, কিন্তু না ভাই সখ নয়—এভাবে একশ্রেণী বিদ্রোহ না চালালে তোদের মানে সামাজিক মানুষদের মর্য্যাদা আরও হীন হোত। আফ্রিকা আমেরিকার মত ক্রীতদাসের

লাঞ্ছনা জুটত ভারতীয়দের ভাগ্যে, হয়নি শুধু জাগ্রত বিদ্রোহী দলের আন্দোলনের ফলেই। তাই বলি তোর দুঃখ, সংসারীর দুঃখ অপেক্ষা আমাদের দুঃখকে ছোট দেখিস না ভাই। কায়িক নির্য্যাতন আমাদেরও কম সইতে হয় নি। দেহের ক্ষিধে অপেক্ষা মনের ক্ষিধেও কম নয়, দেহের ক্ষিধেতে মানুষ সতীত্ব, সন্তান বিক্রি করেছে হয়ত সত্য, কিন্তু জানিস না তুই মনের ক্ষিধে কত মহৎ মানুষের মাথা ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। নির্জ্জন সেলে সদা জাগ্রত পাহারার তলে অনিদ্রায় যখন দিন কেটেছে, তখন অন্তর কেবলি চেয়েছে যত ছোটই হোক না কেন একখানা ঘর, সবল বাহুর নিচে একটু আশ্রয়, কচি মুখের মা ডাক। পাগল হয়ে গেছি এক একদিন যেন! নিজের চুল ধরে টেনে ছিঁড়েছি, কামড়ে দেখেছি নিজের হাতে ব্যথা লাগে কি না? বেঁচে আছি কি না? তাই বলছি ভাই নিজের দুঃখে অধীর হ'য়ে পরের দুঃখটাকে ছোট দেখিস না। দুঃখের বোঝা আজ বর্ষার মেঘের মত চেপে বসেছে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে, অভাবে হারিয়ে গেল ফুরিয়ে গেল এক শ্রেণী, আর এক শ্রেণী ক্ষিপ্তবৎ সঞ্চয় করেছে সম্পদ— সে সম্পদের বোঝা বিপদ হ'য়ে চেপে আছে তাদের ঘাড়ে শান্তি, স্বস্তি দেখতে পাবি না তুই অর্থবানের ঘরেও—"

"কিন্তু বিপাশা বুঝতে পাচ্ছিস না তুই, বড় কথা শুনে চলবার দিন আমার মোটেই নেই। এক কালে বড় কথা আমিও অনেক ভেবেছি। আজ ভাবছি আত্মহত্যার কথা,

আমি মরলে ছেলে মেয়ে দুটোকে অনাথ আশ্রমে না হয় মামার বাড়ী পাঠিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে ও। না হ'লে এমন করে ও আর বাঁচবে না তার পর ত আমায় মরতেই হবে বিপাশা না খেয়ে।" কান্না নর্ম্মদার স্বর রুদ্ধ করে দেয়।

স্নেহমধুর হাতে চোখের জল মুছিয়ে দেয় বিপাশা। "ছিঃ নর্ম্মদা! হার মানলি তুই এরি মধ্যে! এমন দুঃসময় দেশের কখনই থাকবে না, সুসময় আসবেই—আমরা না থাকি থাকবে আমাদের পরবর্ত্তীরা, নারী জন্ম বলে তুই গর্ব্ব করে-ছিলি এক সময় মনে নেই তা? সৃষ্টি করবি তুই বলিষ্ঠ সন্তান, দেশের দশের কাজে দিবি তাদের দীক্ষা শত দুঃখ বেদনাতেও ভেঙ্গে পড়বি না তুই, আদর্শ স্ত্রী হবি—হবি আদর্শ মা, সব ভুলে গেছিস সে সব কথা? তবে কি বুঝব নর্ম্মদাও করে ছিল এক দিন—নিছক রঙ্গীন ভাব বিলাস? প্রয়োজনের কাছে সে পরাজয় মেনেছে।"

"হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ। তোর নর্ম্মদা, তোর প্রিয় বান্ধবী সত্যই হার মেনেছে। আজ বলতে লজ্জা হ'লেও বলছি সে দিনের সে চিন্তা নিছক ভাব বিলাস, কোনটাই দেখছি তা বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়। কল্পনাকে রূপ দেবার কোন রংই আজ ভাণ্ডারে নেই আমার—হার মেনেছি আমি। কি দুঃসহ অভাব, কত অন্যায় অবিচার গরীব গৃহস্থরা সইছে তার ধারণা সত্যই ছিল না শুধুই ভেবেছিলাম সহ্য কোরব।

নারী যে ধৈর্য্যের প্রতীক দেখিয়ে দেব তা সংসারকে ! কিন্তু সহ্য করা আর সম্ভব নয়।

আমি মরে না গেলে ছেলে মেয়ে দুটোকে দাদা বৌদি নিতে চাইবে না, অভাবের পীড়নে তাদের ঘরও বিপর্য্যস্ত ! বোমার সময় গেছলাম—মাস দুয়েকের বেশী টিকতে পারি নি বৌদিদির বাক্য যন্ত্রণার ঠেলায়। কেনই বা দেবে না বাক্য যন্ত্রণা, তোকে দেখে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল খেতে দেব কি ভেবে, তাদেরও তাই। অভাব উলঙ্গ হ'য়ে আত্ম প্রকাশ করলে তা মানুষে মেনে নিতে পারে না। আমি অনেক ভেবেছি বিপাশা কোনও উপায় নেই, মাঝে মাঝে মনে হ'য়েছে আত্ম বিক্রয়ের কথা কিন্তু তাই বা কোথায় কার কাছে যাব ! রূপ যৌবনও ফুরিয়ে গেছে—আত্মহত্যাই কেবল এখন পথ," ফুপিয়ে কেঁদে উঠে নর্ম্মদা।

তিরস্কার করে না বিপাশা, মস্ত বড় অগ্নি গৃহের দ্বার খুলেছে নর্ম্মদা কিছু উত্তাপ বেরিয়ে গেলে তার জ্বালার নিবৃত্তি হওয়ার সম্ভব, নীরবে নর্ম্মদার পিঠের ওপর হাতটা বুলোয় সে।

কান্না সমিত হ'য়ে আসে। তখন বলে বিপাশা—"ও সব যাতা কথাগুলো ভাবিস না নর্ম্মদা। তোর আর কি কোনও মূল্য নেই ? দেহ মূল্য আত্মহত্যা ও সব কি বলছিস ! অভাবে পড়েছিস শ্রম কর মূল্য পাবি। আজকের দিনে স্ত্রী পুরুষে শ্রম না করলে কারো সংসারই চলে না এতো জানা

কথা। তুই এত ভেঙ্গে না প'ড়ে—যে কোনও কাজ যে কোন মূল্যে কর, দেখিস অভাব কমে যাবে।"

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকায় নর্ম্মদা—"কাজ? কি কাজ কোরব আমি আই এ ফেল, কোনও মাস্টারী কেউ দেবে না। নার্সিং? তাও ট্রেনিং নিতে হয় তবে, কোনও চাকরী ও মিলবে না অফিসে এইটুক বিদ্যেয় তবে কি কাজ করতে পারি আমি?"

"কিছু পার না—পার কেবল আত্মহত্যার পরিকল্পনা করতে" ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বিপাশা তার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—"দেখ নর্ম্মদা এদেশের মেয়েদের আত্মহত্যা করাই ভাল। এমনি করে হাত পা গুটিয়ে আজও যারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে থাকবে—তাদের মরা ছাড়া উপায় নেই! মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়েছে দেশ তবু তোদের চোখ খুলল না? মাস্টারী আর কেরাণীগিরি দেখলি মেয়েদের উপার্জ্জনের এক মাত্র পথ! কেন—এত যখন দুঃখ যা না ভাববার তাই যখন ভাবছিস, তখন রাঁধুনীগিরি করে দেখ না? অপূর্ব্ব সুন্দরী নোস—বয়েসও ত্রিশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে, দারিদ্র্যে চেহারা লালিত্যশূন্য ভয় কিসের? লজ্জাইবা কিসের। না হয় ইনস্টলমেণ্টে মেসিন কেন একটা—পেণী, ফ্রগ, ইজের করে দোকানে দে বেশ আয় হবে পেট চলবার মত। না হয় সুপুরী কাট, আচার, পাঁপর চাটনী তৈরী কর, ঝি গিরি কর—হার মানিসনে, দুঃখ তোর ত একার নয়, সারা দেশটাই দুঃখে জর্জ্জর হয়ে আছে, আত্মহত্যা

তাহলে সবাইকেই করতে হয়, বাঁচবার চেষ্টা কর বাঁচার আদর্শ দেখা দেশের সেইটা বড় প্রয়োজন”—

“বলতে সহজ বিপাশা—করতে নয়।” ধীরে ধীরে উত্তর করে “নর্ম্মদা গেরস্থ ঘরের বৌ আমি—কার দোরে যাব ‘ওগো রাঁধুনি রাখ—ঝি রাখ” বলতে? সেলাইয়ের কল কিনব! হাসি আসে বিপাশা তোর কথা শুনে, একটা পয়সা যার ঘরে নেই—তাকে এখন একশো টাকার ফর্দ্দ দিচ্ছিস! তারপর এই অন্ধকার ঘরে এসে কে অর্ডার দিয়ে যাবে? তোর ওসব থিয়োর‍্যাটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল নয় বিপাশা।”

“আমাদেরি দোষে প্র্যাকটিক্যাল হতে পাচ্ছে না নর্ম্মদা। কিন্তু আর না! তোর হাত দিয়েই দেখাতে চাই আমি বাঁচার প্রথম প্রচেষ্টা, দোরে দোরে ঘোরা অসম্ভব নয়—বাঁচার তাগিদে অফিসের দোরে দোরে ঘুরে পুরুষের পা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, কাজেই দোরে দোরে ঘোরায় নারীর অপমান নেই! (পুরুষের সঙ্গে তাল ঠুকে লেখা পড়া শেখা, ট্রামে বাসে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, ভীড়ে চাপাচাপি হয়ে যথাইচ্ছা বিহার—এগুলোই স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম লাভ মনে করে বসে থাকবি তাহলে চুপচাপ?)

“জীবন-যুদ্ধে কোমর বেঁধে পুরুষের পাশে দাঁড়ানর নামই—সত্যিকার সমানাধিকার, একা একটি পুরুষে পারছেনা আজ এতগুলি প্রাণীকে বাঁচাতে। তুইও চেষ্টা কর—তাতে অপমান ত নেই-ই বরং সম্মান আছে যে তুই হার মানিসনি, ফুরিয়ে যাসনি তুই। শান্তির দিন আসে ভবিষ্যতে তুই স্বচ্ছন্দে তুলে

নিবি আবার গৃহ-কর্ম্মের ভার, জীবিকার্জ্জনের পেশা ছেড়ে দিবি তখন! এখন বাঁচ, বাঁচা তোর স্বামীকেও। কাজ কর সাহস শক্তি আপনিই এসে যাবে, রেশনের থলি হাতে—কাপড়ের কার্ড হাতে করে নিয়ে নিজেই গিয়ে দাঁড়া রাস্তায়, দেখবি তোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আরও কত নিপীড়িত নারী তোরই দেখাদেখি, কয়লার ঝুড়ি নিয়ে ত্রিবেণী ভিজবে কেন? তুই যা—সাথী হবে এই মহানগরীর কত ক্ষুদ্র গৃহ বধূ, জীবনযাত্রার যা-কিছু উপকরণেই যখন 'কিউ'এর সৃষ্টি তখন একা পুরুষে কেমন করে তা—সংগ্রহ করবে, আর নারীই বা কেন শূন্যঘরে মানের বালাই নিয়ে বসে রইবে চুপ করে? অফিসে, বাসে, স্কুলে, কলেজে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবী না করে জীবনের কঠিনতম ক্ষেত্রের জন্যই নেমে পড়া আমাদের উচিৎ নর্ম্মদা! কেননা—সহনশীলতা নারীর বেশী—আজকের দিনে জীবন যাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করা সহনশীলতার পরীক্ষারই নামান্তর।

"ওঠ নর্ম্মদা, চল কিছু কাপড় কিনে আনি আজই সারাদিন বসে রুমাল তৈরী করবি, সন্ধ্যেবেলায় দোকানে দিয়ে যা পয়সা পাবি—তাতে অসীমবাবুর সঙ্গে হাসিমুখে বসে চা খেতে পারবি নিশ্চয়। তারপর বাড়ী থেকে এসে কল কেনার ব্যবস্থা কোরব, কিস্তিবন্দীতে কিনলে খুব টাকা বেশী লাগবে না। চল চল—টাকা? ওইত তোর গলায়, ও আমি এসেই লক্ষ্য করেছি, সেই লকেট-টা—প্রথম বিয়ের রাতে অসীমবাবু দিয়েছিলেন—তাঁর ছবি আছে ওতে এইত? তা হোক, মিথ্যে সেন্টি-

মেণ্টালিটি তোকে ছাড়তে হবে, মরেই যাচ্ছিলি আত্মহত্যা করে দে ওই লকেট বিক্রি করে আজ রুমালের জন্য কাপড় সুতো কিনব, তুই কিনবি চল।"

ইতস্তত করে নর্ম্মদা! "ওকে জিজ্ঞাসা করবো না বিপাশা? রাস্তায় বেরুব আজ থেকে?"

উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে বিপাশা—"ওঃ। সুবোধ মেয়েটি, গলায় দড়ী দেবার সময়ও নিশ্চয় তাহলে জিজ্ঞেস করতিস তোর ওকে? ন্যাকামো করিস না নর্ম্মদা চল, কাপড় ঠিক করে নে। শায়া নেই, না থাকে কোনও দ্বিধা আজ তোকে করতে দেবনা— জীবন যাত্রার সহজ পথে, বাঁচার জন্যে যে পথ আজ একান্ত প্রয়োজন সেই পথে তোকে আজ দীক্ষা দিয়ে যাব নর্ম্মদা তুই আদর্শ দিবি আরও অনেককে, এমন করে ধ্বংস হবার জন্যে নারী জন্মায় না—দেখিয়ে দিবি তুই তা এই ধ্বংসোন্মুখ— সমাজকে, নিজেকে ত তুই রক্ষা করবিই—আরও আদর্শ হবি তোর পারিপার্শ্বিক দুঃস্থ সমাজের। আয় আয় আর দেরী করা হবে না—ত্রিবেণী ভাইটিকে খেলা দাও আমরা আসছি"—

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বিপাশাকে অনুসরণ করে নর্ম্মদা। বাঁচবে কি নর্ম্মদা?

নলিনী

জেল গেটের বাইরে পা দিয়েই সমস্ত মন বিরক্তিতে ভ'রে ওঠে নলিনীর! ফুলের মালা, তোড়া, মোটর, বাবা, অজয়—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। সব কেহই, সব কিছুই—যা আশঙ্কা করে ছিল ঠিক তাই।

প্রণাম ক'রে পিতার চরণে "কিসের এ অভিনন্দন বাবা? পরাধীনতার জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে জেলে বসে—দুটো বছর অলস জীবন যাপন করলাম তার জন্য ধিক্কার পাওনা হ'তে পারে, কিন্তু অভিনন্দন নয়! আর অভিনন্দন নেতারাই পেয়ে থাকেন—পাবেনও, আমরা নই।"

অজয়কে শুধু ছোট একটা নমস্কার জানায়—সোজা মোটরে উঠে বসে—নিচু মুখে শ্রীপদ বাবু, অজয় অনুসরণ করেন। ঘট পল্লবে সুসজ্জিত গৃহ-দ্বারেও নলিনী বিরক্তি জানায়—কলাগাছ দুটো উপড়ে ফেলে কলসীটা ডাব শুদ্ধ উলটে ফেলে দেয়। মায়ের বুকের মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে বলে "কি করেছ মা? দেশের কতবড় দুর্দ্দিনে আমি জেলের মধ্যে বসে কাটালাম—আর তুমি তারি জন্যে—আনন্দ উৎসব আরম্ভ করেছ? আজও কত দুঃখ সইছে আমাদের দেশের লোক, আরও কত সইতে হবে তাইবা কে জানে-এরি

মাঝে আনন্দ কেমন করে আসবে মা, এমন করে আমাকে দুঃখ দিওনা তোমরা।"

তার পর সত্যকার জ্বলে ওঠে বিকেলে পার্টির ব্যবস্থা শুনে। তীব্র প্রতিবাদ জানায় "এ-হ'তেই পারে না। দেশে নাই নাই, দুর্ভিক্ষ, অভাবের আগুন জ্বলছে যখন ধূ-ধূ করে, ভাইয়ের ছুরী ঝক-ঝকিয়ে উঠ্‌ছে ভাইয়ের রক্ত পান করবার জন্যে তখন এই উৎসব আয়োজন, অগ্নি লীলার মাঝে নিষ্ঠুর 'নিরো'র বেহালা বাজানর মতই মনে হবে নাকি? এই মুহূর্ত্তে যে টাকাগুলো জলে দেবেন আপনি তার অঙ্কটা, বেশ মোটা। দিন না বাবা ঐ টাকাগুলো আমার হাতে তুলে, আচার্য্যদেবকে প্রণাম করে আসি। নিরন্নের মুখে এখনও তিনি অন্ন তুলে দেবার কাজে ব্যস্ত, দিন না? আমারি মুক্তির আনন্দেও উৎসব করছেন।"

"কিন্তু আমি যে নিমন্ত্রণ করে ফেলেছি।" ভয়ে ভয়ে উত্তর করেন শ্রীপদ বাবু। "এখন আর কেমন করে ফেরাব বল! স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে কিন্তু তাই বলে তুই আমার মান অপমানটা দেখবিনা?" কাতরতায় ভেঙ্গে পড়ে শ্রীপদ বাবুর কণ্ঠ।

গম্ভীর মুখে বসে থাকে নলিনী, পিতার কাতর কণ্ঠে মন তার গলেনা। বুঝিয়ে বলেন জননী "দেখ তুই জেলে গেলি, তারপর দিপুও বিলেত গেল সেই থেকে এবাড়ী কোনই আনন্দ উৎসব হয় নি, তোকে কাছে পাওয়ার আনন্দে যদি

ভুলই করে থাকেন, দোষই করে থাকেন তা তার বিচার তুই করিসনে, সন্তানের কাজ বাপ-মাকে সুখী করা আনন্দ দেওয়া। তুই দেশের দশজনের সেবা করিস। কিন্তু বাবা-মাকে সুখী করাও ত তার মধ্যে একটা কর্ত্তব্য মা!"

বিষাদের হাসি হাসে নলিনী। "সুখের সংজ্ঞাটা কি তা বলতে পার মা? জান তুমি কতটা পেলে মানুষ সুখী হয়? কত টাকা সঞ্চয় করা হ'লে পর মানুষ পরের জন্য দান করতে পারে তার উপার্জ্জনের কতকাংশ বলতে পার? পাবো না, কেউ পারেনি কেউ পারবে ও না। আশা—অর্থাৎ ভোগের তৃপ্তি কোনও দিনও হয় না। আকাংখার নিবৃত্তি নেই। তাই বল'ছি ভোগের পথে যদি সুখের কামনা করে থাক তবে আমাকে নিয়ে তোমরা সুখী হ'তে পারবে না। ভোগের পথে কেউই সুখী হয় না। সুখের কামনা কারোই পূরণ হয় না। আজ চাইছ মুক্তির আনন্দ জানাতে। কাল চাইবে বিয়ের আহ্লাদ প্রকাশ করতে। তার পর চাইবে নাতি নাতিনীর সৌভাগ্য দেখাতে—চাওয়ার কি শেষ আছে মা?"

নলিনীর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় স্তম্ভিত হ'য়ে বসে থাকেন শ্রীপদ বাবু কিছুক্ষণ। উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে নলিনী। আবার বলেন তার মা! "পাগল হ'লে ত চলবে না মা। অত লোক নেমতন্ন হ'য়েছে এখন তুই বারণ করলে হয় কখনও? তার ওপর অজয়কে আজ পাকা কথা দেব"—

"ঐটি করতে পাবে না মা।" তীব্র কণ্ঠে উত্তর করে

নলিনী। "নেমতন্ন করে থাক পার্টি হবে আমার মতামতের কোন কথাই আর ওঠে না কিন্তু অজয় বাবুর সঙ্গে পাকা কথায় আমার অমত আছে, ওঁকে বিয়ে আমি কোরব না।"

"সে কীরে!" চমকে ওঠেন নলিনীর মা। "তোর দাদা বিলেত যাবার সময় পাকা কথা দিয়ে গেছে তাকে বৌবাজারেব বাড়ীখানা যৌতুক দিতে বলে গেছে পর্য্যন্ত, তুইও ত ভাল মনে মত দিয়ে ছিলি এক দিন তবে আবার কি হল?"

দেখো মা কাল কি হয় আজ তা বলা যায় না। এতো দু বছরের কথা। মত আমি বদলে ফেলেছি। অজয় বাবুকে আমিই বোলব বুঝিয়ে। তোমাব কোনও উদ্বেগ করতে হবে না।"

"উদ্বেগ ত করব না! কিন্তু তুই বললি বলেই উদ্বেগ দূর হবে তাতো নয়। তোব বিয়ে আমি এই আসছে মাসেই দিতে চাই বোম্বেটেগিরি করে আর বেড়াতে দেব না তোকে আমি। ওঁর আস্পর্দ্ধা পেয়ে তুই যা তা করে বেড়ালি এতদিন।"

"বেশত মা বিয়েই দিও।" একমুখ হেসে উত্তর করে নলিনী "তবে অজয়েব সঙ্গে নয়—আমি বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে কোরব মস্ত বড লোক হওয়া চাই। সববনাশ কোরব তাব—স্পর্দ্ধা তাদেব ধূলোয় লুটিয়ে দেব—ছিনি মিনি কবে ছড়িয়ে দেব তাদেব টাকা—বড লোক বড লোক! অনেক ভেবে জেলে বসে এই পলিসি ঠিক কবেছি শীঘ্রই বিয়ে কোরব আমি"—চোখের দৃষ্টি হয়ে যায় তার হিংস্র, হাত দুটো মুঠি বেঁধে অস্থির পায়ে পায়চারি করে নলিনী—

ভয় পেয়ে যান মা তার ভয়াল ভাব দেখে।

(২)

মায়ের কথা রাখে নলিনী সামনের মাসেই বিয়ে করে। আপনার প্রতিজ্ঞাও পূরণ করে মস্ত জমিদার প্রচুর বিত্তশালী স্বামী গ্রহণ করে।

শ্রীপদ বাবুরই মক্কেল অতুল বৈভবের উত্তরাধিকারী বৃদ্ধ জমিদার ভূপতিরঞ্জন এসেছিলেন পোষ্য নেবার বন্দোবস্ত করতে। অপুত্রক সম্প্রতি পত্নী বিয়োগও ঘটেছিল। তাঁকেই পাকড়ে নলিনী রাজী করায় বিয়ে করাতে। আপত্তি উঠেছিল নলিনীর বাপ-মায়ের তরফ হ'তে, আর জমিদার ভূপতি রঞ্জনের 'সিদ্ধ ভাত খাবি? না হাত ধোব কোথায়' গোছের আপত্তি সে আপত্তিই না।

নলিনীর যুক্তি-তর্ক আর তার ইচ্ছের ওপরে উঠতে পারেন নি তার বাপ-মা। বিয়েটা অগত্যা হ'য়েই যায়। শুধু নিভৃতে প্রশ্ন করেছিল অজয় "এ-খেলা বুঝতে পারছি না নলিনী। বুঝতে পারছি হয়ত বা একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে কিন্তু কি তা খুলে বলবে নাকি? কি এমন কাজ যার জন্য এত বড় মূল্য তুমি দিচ্ছ?"

"বড়ই বটে কাজ। তার তুলনায় মূল্য কিছুই না। তবে এখন তা বোলব না। আপনি আমার শুভাকাঙ্খী বন্ধু। আপনার সাহায্যও দরকার হবে অভিনয়ের শেষ অঙ্কে।

আশীর্ব্বাদ করুন দুঃসাহসিক অভিযান আমার সফল হয়। 'ফলো' করবেন মাঝে মাঝে আমাকে তা'হলে অনেকটা নিজেই বুঝতে পারবেন।"

কিছুদিন 'ফলো' ক'রেও অজয়, নলিনীর দামী গাড়ী— রোজই যাতায়াত করে হ্যামিণ্টনের বাড়ী, ঠাকুরলাল হীরা-লালের দোকান, লিলারাম, নভেলটি ষ্টোরে। রাস্তার লোকের পিলে চমকিয়ে নলিনীর গাড়ী তীর বেগে যাতায়াত করে টালিগঞ্জ হ'তে টালা, বালীগঞ্জ হ'তে বেলেঘাটা-এর মধ্যে যতোগুলো সিনেমা আছে তার কোনটাও-সে বাদ দেয় না— দেখতে। বন্ধু বান্ধবীর কোনও পার্টি কোনও ভোজ সভাতেই সে থাকে না অনুপস্থিত! বিলিতি কোম্পানীর দোকান ছাড়া করে না সে মার্কেটিং, বৃটিশ মেড্ ছাড়া কেনেও না কিছু।

আর স্বামী! বৃদ্ধ স্বামীকে কাছ ছাড়া করেনা তিলার্দ্ধও। শীতের সময় লেকের হাওয়া খেতে, গরমের দুপুরে জু গার্ডেনে বেড়াতে বড় কষ্টই হয়, নলিনীর বাহু বন্ধনে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বসে সিনেমা দেখতে বড় লজ্জাই করে—তবু! তবুও তরুণী ভার্য্যার প্রীত্যর্থে না করে তা পারেন না, ফলো করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অজয় কিছুই বুঝে উঠ্তে পারে না একী খেলা নলিনীর। ঐশ্বর্য্যের পায়ে এমনি করে বলি দিয়ে নিজেকে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবে নলিনী কে জানে। নলিনীর মায়েরও মন সর্ব্বদা থাকে সন্দিগ্ধ—মাঝে মাঝে ফলো করতে চেষ্টা করেন তিনিও,

নলিনীকে দেখতে যাওয়ার ছল করে পড়তে যান তিনি তার বুকের ভাষা তার মনের ভাব। কিন্তু কম-ধূর্ত্ত নলিনীও নয়।

কেন মা আসে কি তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন তা সেও জানে। গয়না কাপড় দেখিয়ে, বিরাট সংসারের লাখ দু-লাখের হিসেব নিকেশের দায়িত্ব নেওয়ায় তিলার্দ্ধ অবসর নেই বুঝিয়ে মাকে তাক লাগিয়ে দেয় নলিনী।

মিসেস্ সিনহার বাড়ীর পার্টিতে কোন মহারাজকুমার-পত্নীর গলার হীরের নেকলেস দেখে সে তক্ষুণি সেই ডিজাইনের গড়াতে দেছে, মিঃ চুকারবাটীর ছেলের বিয়েতে দেখে এসেছে নতুন রকম হীরের দুল ঠাকুরলালকে বলা হ'য়েছে তেমনি দুলের নমুনা দেখাতে সবিস্তারে নলিনী শোনায় মাকে তারি কাহিনী।

কি কিন্তু মায়ের সন্ধিগ্ধতার মেঘ যেন কেমন কাটতেই চায়না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোঁজেন নলিনীর মন, তার তলোয়ারের ধারের মত বুদ্ধি আগুনের শিখার মত দৃষ্টি এসব ত গহনা কাপড়ে ঢাকা পড়বার নয়। তবে ?

তবুও ক্রমে ক্রমে আশ্বস্ত হ'তে থাকেন জননী হয়ত বাঁধা পড়তে পারে নলিনী আশ্চর্য্য হ'লেও অসম্ভব ত নয় তা।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গতে দেরী হয় না কয়েক দিনের মধ্যেই—চাপা তর্জ্জন গর্জ্জনে ছুটে যান ড্রয়িং রুমে—জামাই অর্থাৎ জমিদার ভূপতিরঞ্জনের গলা নয় ? তাইত !

শ্রীপদ বাবু হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে দেন—একখানা চিঠি—

থর থর করে কেঁপে বসে পড়েন নলিনীর মা—চিঠিতে লেখা ছিল "আমি যাচ্ছি আমার আশ্রমের কাজে, সঙ্গে কিছু নিলাম, আমার গহণাগুলো সব বিক্রি-করেছি-কদিন ধরে। লাখ দুয়েক তার জন্যে পেয়েছি আর আয়রণ সেফে যে খুচ্‌রো লাখ খানেক ছিল সেটা নিয়েছি, আর এদিক ওদিক করে সামান্য কয়েক হাজার। যাইহোক তোমার অনেক আছে, তার থেকে গেলে কোন ক্ষতিই হবেনা, অথচ আমি যে কাজ কোরব ও টাকায় তার সঙ্গে তুলনা করলে টাকাটা নেহাৎ তুচ্ছই মনে করছি। আমি ভালো লোকের সঙ্গেই—যাচ্ছি তিনি আমার কোন অপমান হ'তে দেবেন না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। মেলা হৈ-চৈ করে খোঁজ করলে—তোমাদেরই ক্ষতি হবে কেননা বড় একটা সমাজিক মর্য্যাদা তোমাদের—স্ত্রীর পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে না—আচ্ছা—

ইতি নলিনী—

(৩)

দেশ সেবকের যা প্রাপ্য, যা দিই আমরা দেশ সেবকদের—সেই লাঞ্ছনার বোঝা ব'য়ে বন্ধুর বিপদাকীর্ণ পথে চলেন অনেক কর্ম্মী, অনেক মহামানব।

অভীজিৎ তাঁদেরি একজন, ছুর্গম গণ্ডগ্রামে মেদিনীপুরের মত ছুঃখ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত জেলায় তার আশ্রম বা বিপ্লব প্রতিষ্ঠান। লাঞ্ছিত দুর্দ্দশাগ্রস্থদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার, সেবা, দান, সংঘ-বদ্ধতার আন্দোলনই ছিল তার প্রথম আর প্রধান উদ্দেশ্য, তারপর আসে নর শোণিতাক্ত আগষ্ট বিপ্লব, আসে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—মেদিনীপুর বাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা থাকে না সে সময়—তারপরই আসে পঞ্চাশের মন্বন্তর। বৃটিশ-প্রভুদের সহনাতীত নির্য্যাতন তার সাথে আসে।

টিক্ টিকি—পুলিসের চোখ এড়িয়ে,—বিদেশী শাসকের আইন বাঁচিয়ে, বিশ্বাসঘাতক ধনকুবেরদের অত্যাচার সহ্য করে বহু দুঃখে বড় কষ্টে অভীজিৎ বাঁচিয়ে রেখেছিল তার সেবা-শ্রমকে বাঁচিয়ে ছিল আপনাকে!

ধরা পড়েছিল সমস্ত সহকর্ম্মী কর্ম্মিণীরা ইন্দু, কালীনাথ, সুনীল, নলিনী, রেখা প্রভৃতি। সাধুর আশ্রমে রূপান্তরীত ক'রে—নাম সংকীর্ত্তনের মহড়া দিয়ে—কোনও মতে আশ্রমের অন্নদান ব্রতটুকু—সম্পূর্ণ একাকী চালাচ্ছিল অভীজিৎ কিন্তু তার সাধ্যাতীত হ'য়ে আসছিল যখন, যুদ্ধান্তের সমস্যাও যখন সব নিপীড়নের ওপরেও আর একটা সমস্যা হ'য়ে মানুষকে হা অন্ন-হা অন্ন করে কাঁদাচ্ছিল অভীজিতের সেবা ব্রতের পুঁজি একেবারেই শূন্য যখন—যখন "আমার ভাণ্ডার আছে তোমা সবাকার ঘরে" কথাটিকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল সকলেই, হাত পেতে দাঁড়াচ্ছিল যখন সকলেই

বিচ্ছিন্ন, বিচূর্ণ, অর্দ্ধমৃত বুভুক্ষ নর কঙ্কালগুলিকে সংঘ বদ্ধ করবার, বাঁচিয়ে রাখবার কোনও সামান্যতম উপকরণ পাচ্ছিল না যখন অভীজিৎ তখন—তেমনি সময়েই—

প্রচুর অর্থ,—আশাতীত সাহায্য এনে তুলে দেয় নলিনী তাদের সংঘাচার্য্য—অভীজিতের হাতে। একে একে অকপটে বলে যায় তার সংগ্রহ কাহিনী; নিস্তব্ধে বসে শোনে অভীজিৎ।

"তবে যাই এবার?" চৈতন্য হয় অভীজিতের নলিনীর প্রশ্নে—"হ্যাঁ! যাবে ছাড়া আর কি বোলব তোমায়। আমি বড় তুমি ছোট, অহংকার ছিল আমি তোমাদের গুরু! কিন্তু আজ তোমাকে নমস্কার কচ্ছি নলিনা স্বাকার কচ্ছি অকপটে তোমার মত ত্যাগ আমরা করতে পারি না, সাহস নেই তোমার মত। ধন্যবাদ দিয়ে তোমায় ছোট কোরবনা—আশীর্ব্বাদ করবারও যোগ্যতা নেই, প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের কাছে তোমার এ ত্যাগ সফল হোক! মৃত ভারতবাসী প্রাণ পাক! তোমার এই ত্যাগে জাগুক তাদের মর্য্যাদা বোধ। বাঁচুক! অন্ততঃ কিছুটা লোক বাঁচুক তোমার এই দানে।"

(৪)

একান্তে দেখা করে অজয়। "এবার নলিনী অনেক ঘোরালে—একটা বছর ফলো করে চলেছি তোমাকে এবার আমার আশা পূর্ণ কর।"

"কি আপনার আশা অজয় বাবু"! প্রশ্ন করে নলিনী! "সামান্য একটা দেহ। তাও ত অন্যের উচ্ছিষ্ট, এরজন্য এত আপনার লোভ? দেশের কাজ কোরব বলে কত বলেছেন এক সময়, আজও সে বাসনা একেবারে ত্যাগ করেননি তা জানি, কিন্তু বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বহন করে অবসরে অবকাশে সৌখীন দেশ সেবার দাক্ষিণ্যে কতদিন আর চলবে; আত্মত্যাগী কর্ম্মী না হ'লে দেশকে জাগান কি সম্ভব; আপনার সুখ বলি না দিয়ে—পরের জন্য সম্পূর্ণ কাজ আপনি করতে পারেননা—একথাও অজানা নয় আপনার—"।

"কিন্তু নলিনী! তুমি আমাকে যে আত্মত্যাগের পথ থেকে টেনে আত্মহারা করে তুলেছ। অভাজিতের সঙ্গে—অভীজিতের হাতে হাত মিলিয়ে চলছিলাম ত' আমি কেন তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে আমার; দাঁড়ালে ত কেন সাধারণ মেয়ের মত—দাঁড়ালে না! অসাধারণ মহিমার পায়ে তোমার আমাকে যে-বিকিয়ে দিয়েছি একেবারে। কেমন করে তা আর ফিরোবো বল"—?

দুঃখিত ম্লান কণ্ঠে উত্তর করে নলিনী—"কি মনে হচ্ছে জানেন অজয় বাবু; নারীজাতটার ওপর অভীসম্পাৎ দিতে, ঈশ্বর বুঝি নারীকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টির বিঘ্ন ঘটাবারই জন্য। আজ থেকে আলোচনা করুন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত দেখবেন আমার কথা সত্য কিনা। হানাহানি যুদ্ধ বিগ্রহ সবকিছুই যেন নারীকে উপলক্ষ্য করে। সেই নারায়ণের

মোহিনীরূপ ধারণ করা হ'তে ইয়োরোপের মাতাহরি পর্য্যন্ত ঘটাচ্ছে জঞ্জাল। কত মুনি, ঋষি, মহাপুরুষ বিলুপ্ত হয়ে গেছেন নারীকে আত্মার্পণ ক'রে ভারতের শৃঙ্খল মুক্তিও বোধ হয় ঘট্‌ছে না নারীবই কাবণে।

"কিন্তু নারীব এ ইচ্ছাকৃত দোষ নয়—, অভীসম্পাৎই বা কাকে দেব"।

"কেন নলিনী এমন কথা বলছ তুমি। বিবাহিতেরা কি দেশের কাজ করতে পারেনা? প্রেম ভালবাসা কি দেশ সেবার পথে বিঘ্ন? একথা আমি মানি না। দেশের মধ্যে বড় বড় নেতা যাঁরা, তাঁরা ত সবাই বিবাহিত, কেমন বরে আমরণ তাঁরা দেশের জন্য সংগ্রাম করছেন—গতায়ূবা করে গেছেন?"

তুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় নলিনী—"মহামানব—মহাত্মা তাঁরা, তাদের কাজেব কোন সমালোচনাই কোরবনা অজয় বাবু তবে এইটাই বলতে চাই—সকল কর্ম্মেব মধ্যেই যেমন কর্ম্ম বিভক্তি আছে অর্থাৎ এক এক শ্রেণীর লোক নির্দ্দিষ্ট এক-একটা কর্ম্ম করে থাকে—রাজার, সেনাপতির, সৈনিকের কাজ যেমন একবকম নয়—তেমনিই—নেতারা বিবাহিত জীবনে সফলতা লাভ করলেও—আপনি আমি রাম, শ্যাম, লীনা, বীণা তা পারেনা, আমাদের কাজ অন্য। মনে নেই কি আপনার স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান, 'দশ হাজার, ভারতের কোটি কোটি ছেলে মেয়ের মধ্যে মাত্র দশ হাজার"

সন্ন্যাসী ছেলে চেয়েছিলেন তিনি? বড় দুঃখ পরিতাপ হয় অজয় বাবু তাঁর আহ্বানে কেউ সাড়া দিলনা—খেয়ে, ঘুমিয়ে আজও ফুরিয়ে যাচ্ছে—আপনাদেরই মত সব ছেলে—, শুদ্ধ মন তাজা প্রাণ নিয়ে কেউ অগ্রসর হচ্ছেনা আজও। থাক সেকথা! কাজের কথা আছে একটা, জানেনত—আপনাদের এই সেবাশ্রমের ক্যাসের ভার আমি নিয়েছি? যত টাকা লাগে—কাজ করে যান আপনার সব ভার আমার"।

"কিন্তু তোমার এভাবে দেহ-বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের কথা মনে করতে ঘৃণা হচ্ছে না? অসৎ পথে উপার্জ্জিত অর্থ সংঘই বা নেবে কেন? অভীজিত কি বলবে এসব কথা শুনে সেকথাই বা ভাবছনা কেন"?

"আপনার কথা শুনে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে অজয়বাবু! সামান্য এক খণ্ড দেহ, মাংস পিণ্ডের মত একটা নরীদেহের জন্য আপনি কেন এতটা অবুঝ হ'চ্ছেন? আপনি বিপ্লববাদী—একটা প্রাণ বা দেহের-মূল্য কতটুক বৈপ্লবিক কাজে, তা আপনার অজানা নেই—; প্রাণকেই পণ করে বেরিয়েছি আমরা এই পথে—প্রাণ আর দেহ পৃথক নয়, সংঘের কাজে—প্রাণ বা দেহ দেওয়া কিছুই বেশী নয়। প্রাণ বা সম্মান অপেক্ষা আমার কাছে সংঘের স্বার্থ বড়—তাই সম্মান বা দেহকে পণ রেখে কাজে নামবার কল্পনা করেছি আজ। আর অসৎ পথে উপার্জ্জিত অর্থ সংঘ নেবে কেন বলছেন? বলতে পারেন অর্থকে কবে ধর্ম্ম পথে সৎ পথে উপার্জ্জন করেছে?

"প্রজার রক্ত শুষে, দশ টাকার জিনিষ হাজার টাকায় বিক্রি করে, মক্কেলের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করে, রোগীর ঘরের ঘটি বাটি পর্য্যন্ত বাঁধা দেওয়া পয়সায় বড় লোক জমিদার, ব্যবসায়ী, উকীল ব্যরিষ্টার, ডাক্তার! সেগুলোকে কেমন করে বলবেন আপনি শুদ্ধাচার? শুদ্ধাচারে আর যাই হোক অর্থ লাভ হয়না একথা ঠিক, অথচ—মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত—জনগণকে জাগাতে হলে, বাঁচাতে হ'লে চাই অর্থ, প্রচুর অর্থ। গান গেয়ে কৌটো হাতে করে বেড়ালে সে অর্থ লাভ করা যায় না—তাই আমার এ আয়োজন। সংঘ, অভীদার আদর্শকে ভুল বিচার করবেন না আপনি—অর্থ তাঁদের প্রয়োজন—তাঁরা নেবেন ব্যাস্।"

"কিন্তু তুমি যাই বল নলিনী। দেহবিক্রী করাকে দেশ সেবা বলে কেউ সমর্থন করবে না—করতে পারে না। শুনলে ঘৃণা হয় মনে, এপথে তোমাকে আমি চলতে দেব না কিছুতেই।"

"বুঝতে পাচ্ছি কোথায় আপত্তি। কিন্তু সে কথা যাক বার বার দেহ বিক্রি করাইবা কেন বলছেন? কেন অধর্ম্ম জোচ্চুরী ভাবছেন,? জানেন সভ্য ভাষায় জোচ্চুরীর একটা নাম আছে—ইনটেলিজেন্সী? বুদ্ধিমান বলে আখ্যা পলিসিবাজেরাই পেয়ে থাকে? দেহ বিক্রী কেন বলছেন মন্ত্র পড়ে রীতিমত বিয়ে করেছি আবার—দরকার মত, সুবিধা মত, কাউকে বিয়ে কোরব কার্য সিদ্ধির জন্য, এমনি ধারা বিয়েই করে চলব একটার পর একটা।

"ধরুন খৃষ্টান মতে সে দৃষ্টান্ত ত পাপের নয়? যাক সেকথা—আমি বুঝতে পারছি অজয় বাবু কোথায় আপনার ব্যথা," কোমল হয়ে আসে নলিনীর কণ্ঠ—"নলিনীকে ছেড়ে দিতে মন আপনার ভেঙ্গে পড়ছে—পারছেন না তা কিছুতেই সহ্য করতে। কিন্তু মিনতি করি আপনাকে অজয় বাবু, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর এ মাংস পিণ্ডের ওপর মোহ ত্যাগ করুন। ঘর-কন্নার মধুর লোভ এবারের মত ছেড়ে দিন আপনার আদর্শে আমাদের সংঘের পরবর্ত্তীদের উপকার হবে তাহলে। দেশের পক্ষে আজ একান্ত প্রয়োজন ঘর ভাঙ্গা, ঘর ছাড়া গুটিকত ছেলে মেয়ে, অবসরে বসে—সৌখীন দেশ প্রেমের দ্বারা একটা জাতকে বড় ক'রে তোলাকি সম্ভব!" কোমল কণ্ঠে নলিনীর হাত ধরে বলে অজয়—"সত্যি নলিনী তোমাকেই ত্যাগ করতে আমি পারছিনা কেমন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে আমার সমস্ত জগৎ উজ্জল হ'য়ে আছ শুধু তুমি শুধু তুমি—। না হ'লে অন্যের বিবাহিতা হ'য়ে যখন তুমি চলে গেছলে তখনও ত তোমার কথা ভুলতে পারতাম। পারবনা তা—নলিনী একান্তই কি অসম্ভব আমাদের মিলনের আশা? পারবেনা কি তুমি আদর্শ চ্যুত হ'তে?"

"হয়না তা অজয় বাবু। এ ছাই দেহ এ জন্মে আপনার পায়ে দিতে পারিনে।

যদি পর জন্ম থাকে তবে যেন তোমারি হ'তে পারি—নলিনী হ'য়ে জন্মে স্বামীরূপে যেন তোমাকেই পাই এই

কামনাই শুধু এজন্মের, আর কিছু হয়না। অজয়—আমার একামনা বড় মধুর—স্বাধীন ভারতের সুখী ভারতের মেয়ে হ'য়ে—হব তোমার গৃহ লক্ষ্মী সন্ধ্যাদীপ জ্বালব তোমারি ঘরে গর্ভে ধারণ কোরব তোমারি সন্তান—বড় মধুময়—বড় শান্তির চিন্তা এ আমার কিন্তু এ জন্মের জন্য নয় এ চিন্তা।

"দেশের দৈন্যতা, মূর্খতা আকর্ষণ করছে আমাদের সর্ব্বনাশের পথে, পরাধীনতার পথে, ধ্বংসের পথে। এ ভারতে এমন মধুর কল্পনা করা বাতুলতা! কাজ! কাজ! কাজ! কাজই শুধু সম্বল আজকের জীবনে, সে কাজে চাই তোমারি মত হিতাকাঙ্খী সাথী, সাকী নয় বন্ধু নয়—, রক্ষক-সাথী। আমার পেছনে জমিদার ভূপতি রঞ্জন গোয়েন্দা লাগাতে ছাড়বে না—এই মুহূর্ত্তে এ দেশ থেকে পালাতে হবে—ছদ্মবেশে—ছদ্ম পরিচয়ে—তুমি ছাড়া আমার সহায় হবে কে বল?

"হাসিমুখে তুমি আশীর্ব্বাদ কর অজয়—অবিচল চরণে যেন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অতিক্রম করে যেতে পারি। দেশের উপকারের সঙ্গে তুলনায়, অতি সামান্য এই দেহ আমার—সম্পূর্ণ উৎসর্গ যেন করতে পারি—! বিরস মুখে থেক না তুমি।"

সরযূ

"ওগো-ও ছোট বৌ—তোমার রাজপুত্তুর ছেলে ডাক জুড়েছেন। ধন্যি ছেলে বাবা! বুড়ো ধাড়ী বয়েসেও লজ্জা-রত্তি নেই! খাচ্ছিস ঘুমুচ্ছিস মা বেটায় পড়ে আছিস পরের ঘাড়ে। তার ওপর একমাস ধরে রোগ, ওষুধ পত্তরের কামাই নেই। জননী কাজ করছেন এ্যাড়ো এ্যাড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাবে! ওমা, কোথায় লজ্জায় মরে থাকবে—তা না জীগীর দিচ্ছেন ওমা—মাগো, ঢং দেখে আর বাঁচিনে"। ধড়াস্ করিয়া উঠে সরযূর বুকের ভিতর! সুব্রত অবুঝ নয়, অস্থির ত হয়না সে কোন দিনই, তবে? "তুমি একটু ডাল্‌না-টা দেখো দিদি চট্ করে দেখে আসি আমিও ত অমন করেনা" অপরাধ কুণ্ঠিত তরিৎপদে চলিয়া যায় সরযূ গজ গজ করিতে থাকে প্রভাবতী "ভাল তাল হয়েছে বাপু! রোগ বালাই ছিলনা এ্যাদ্দিন, খায় দায় ষণ্ডার মত বেড়ায় পাথুরে শরীর মা ব্যাটার"। ভ্রাতার জল খাবারের লুচি করিতে ছিল মেজ-গিন্নী, বড় যায়ের সহিত বনি-বনা তেমন না থাকিলেও—সরযূর ব্যাপারে সম-ব্যাথী দু'জনাই, হাতির মত গতর লইয়া সরযূ সেবা করিতেছে বিশ বছর সকলেরই। বাপ-মা নাই, ভাইবোন তাহাও কেহ নাই, গলগ্রহ স্বরূপ মানুষ করিয়াছিলেন এক-জ্ঞাতি কাকা, বিবাহের

পর এক দিনও আর খোঁজ লন নাই। কোন দিন গঙ্গাস্নানে পর্য্যন্ত যায় না সরযূ, মাথা ধরে না একদিনও, সুনিপুণ হস্তে সেবা করে সংসারের।

হঠাৎ একি ঝঞ্ঝাট, এক মাসের মধ্যে বিপর্য্যয় বাধিয়া গেছে বাড়ীতে। মেজ বাবু পান না পাইয়া কাল যথেষ্ট বকাবকি করিয়া গেলেন মেজ-গিন্নী সুমতিকেই—ভাই যথা সময়ে ভাত না পাইয়া বকিল সুমতিকে "একটা মানুষ যদি দুদিন ক্লান্তই মনে করে তা তুমিওত দুটো ভাত চড়ালে পারতে দিদি তোমাকেত কেউ মাথায় দিব্বি দিয়ে বারণ করেনি"। শোন কথা, দু'টো লোককে পুষিতে হয় ভাত দিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া লইবেনা। বড় গিন্নীর বড় ছেলে শ্যামলও বকিয়া গেল মাকে, মেজ-কাকীকেও ঠেস দিয়া, কেন ছোট-কাকীর যদি সময় নাই হয় তুমি কি মেজ-কাকী দুদিন চালাতে পার না! তোমরা যে রাঁধতে জান সেটাও ত আমাদের দেখান দরকার। বাঃ রে! রাঁধিতে জানিবেনা কেন! তাই বলিয়া ভাত দিয়া লোক পুষিয়াও রান্না ঘরে পড়িয়া থাকিতে হইবে?

আর ওই বা করিবে কি? সোমত্ত বিধবা সর্ব্বদা কাজে থাকিলেই না সব রিপু বশে থাকে। ওর ভালর জন্যইত! একটাত ভারি ছেলে আর কেউ নেই যে তাদের কন্না করবে। তাও কম করে নাকি? ছেলের জামা কাপড়ের ত ঘটা শ্যামলের বাদ পড়া পরেই মানুষ তাই কি ছিমছাম পরিষ্কার, একটা বোতামেরও কখনও ত্রুটি হবার যো নেই

বইগুলোর পৃষ্ঠা বদল হচ্ছে রোজই প্রায়, বে-আক্কিলে মাগী আবার ছেলের জুতো পর্য্যন্ত ঝাড়ে, কি, না একমনে পড়িবে ছেলে।

সহানুভূতির সহিত সুমতি উত্তর করে "তোমার যেমন দয়ার শরীর দিদি! আরে বাপু পাত্র অপাত্র দেখতে হবেত; না দয়া করলেই হ'ল! তোমায় বলে কিনা দিদি ডালনাটা দেখো? কত বড় স্পর্দ্ধা বলত? রান্না ঘরে ঢুকলে বলে তোমার মাথা ধরে তায় উনুন তাত!"

"অহংকার দিদি অহংকার, ছেলে মেডেল পেয়ে পাস করেছে জলপানি পাবে, তারপর চাকরি একটা জুটলেই আর কি পাথরে পাঁচকিল, তা—যাই বল দিদি আমি বামুন খুঁজতে বলে দেব আজ, ছেলে মরুক বাঁচুক ও প্রাণ ভরে সেবা করুক, আর বাপু পষ্টই বলে দিচ্ছি—তুমিও ছোঁড়ার কলেজের মাইনে দিতে পাবে না, ওদের এবার বিদেয় কর, ছোঁড়ার খোরাকী পেলে বামুনের হবে—কলেজের মাইনেতেই বামুনের মাইনে হবে কত সুবিধে বল দেখি"?

সুব্রত অপেক্ষা বামুনে খাইবে ঢের বেশী, কলেজের মাহিনার চাইতে বামুনঠাকুর মাহিনা লইবেও বেশী—তাহার উপর রান্নাটাও এমন রসনা তৃপ্তিকর হইবেনা, ওলের ডালনা পটলের ঘণ্ট, পালন শাক, চিংড়ির মালাইকারি এসব পরিপাটি করিয়া রাঁধিবার যোগ্যতা বামুন ঠাকুরের কেন সরযূ ব্যতীত আর কোনও মেয়েরই হয়ত হইবেনা ইহা প্রভাবতীর প্রত্যক্ষ ধারণা।

তবুও—সুমতিকে চটাইতে ভয় লাগে—সরযূ না পারিলে তুই চারদিন সুমতি চালাইতে পারিবে, প্রভাবতীর নিজের কোন যোগ্যতা নেই, সরযূর সেবা লইয়া লইয়া সে একেবারে অথর্ব্ব বনিয়া গেছে। আমতা আমতা করিয়া সমর্থন করে সুমতিকে "তাহ'লে ত ভালই হয়! তবে কি না বিবি সাহেব পড়া ছাড়ালে হয়। এণ্টেন্সো পাশ করে এলো যখন তখন আমি বলেইছিলাম—আর পড়িওনা, ওমা! মেয়ে ভাসুরের সামনে গে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। তারপর বোলবই বা-কি পেটের শত্তুররাও ত আমার কেউ কম নয়। শ্যামল বলে সে-কি! জয়ন্তী বলে সে-কি! আবার চ্যাং উজোয় ব্যাং উজোয় খলসে বলে 'আমিও'! ছোট ছোঁড়াটা বলে কি, না-"ওমা—সুবুদার পড়া বন্ধ করবে, ওর কি মাথা। ফার্ষ্ট হ'তে হ'তে রয়ে গেছে তার চাইতে আমারই না হয় ছাড়িয়ে দাও খরচ-বাঁচবে। "জানিসত ভাই সব তুই" "সে যদি বল্লে দিদি" আব্দারে গলিয়া পড়া সুরে সুমতি বলে "তোমারি হ'ল দয়ার শরীর। সব্বাই বলল তুমি গ'লে গেলে! এই বাজারে একটু শক্ত না হ'লে চলে? লোক বলে নিজের ছেলে মেয়ে পড়াতে পারেনা, আর তুমি খরচ দিচ্ছ একটা গলগ্রহকে। খেতে দাও, পরতে দাও তা সহ্য হয়, তা-না পড়াচ্ছ! পড়ান কি সোজা? আর লাভ? তোমার ছেলেদের মুখ হেঁট হচ্ছে! তোমার শ্যামল কখনও ফার্ষ্ট হতে পারেনি, বিমল নয়, জয়ন্তীত পারলইনা আবার জয়ন্তীর বরও শুনেছি তিনবার ফেল করে বি, এ পাশ করেছে, আর তাদেরি

পুরানো জামা কাপড় পুরানো বই পত্তরে মানুষ হ'য়ে ও ছোঁড়া হবে ফাষ্টো ? এ তোমার কি রকম ভাল মানুষী বলত ? আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও তিনটে মেয়ে, পড়াবই না তাদের আমি ঠিক করেছি না কিন্তু তোমার ! না দিদি ও ছোঁড়াকে আর পড়ান হবেনা কিছুতেই" !

"তা বেশত ! তুই যখন বলছিস অত করে, আমার ভালোত আমি বুঝিনে, মার পেটের বোনের মত তুই—, তা যাই ওপরে পাখাটা খুলে একটু বসিগে বড় গরম"—"যাও দিদি, তোমার কি এসব সয় ? ডালনাটা আমিই নামাচ্ছি যে গরম, তুমি যাও" হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রভাবতী—খুন্তি তুলিয়া উনুনের সমুখে বসে সুমতি।

(২)

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায় সরযূ ! রক্ত ! তাজা রক্ত উঠিয়াছে সুব্রতর মুখ দিয়া ! চোখের সম্মুখ হইতে সব কিছু অদৃশ্য হইয়া যায়—গভীর অন্ধকারে যেন ডুবিতে থাকে সে ! সমস্ত সংজ্ঞা দিয়া—প্রাণ পণে চেষ্টা করে চৈতন্যকে ধরিয়া রাখিতে, মাকে দেখিয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে সুব্রত "কি হবে মা ! কি হ'ল ! আমাদের যে এখুনি এরা তাড়িয়ে দেবে কোথা যাব আমরা ? কোথায় আশ্রয় পাব !" ছিঃ ছিঃ ! ছিঃ ! সুব্রতর বিলাপে চৈতন্য জাগিয়া উঠে সরযূ করিয়াছে সে—সুব্রতর সম্মুখে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছে

তক্তা পোষের তলে পিকদানীটা ঠেলিয়া গামছায় মুখ মুছাইয়া দেয় সুব্রতর। গেলাসে জল আনিয়া চোখে মুখে মাথায় ঝাপটা দেয়—"কি আবার হ'ল? হবে আবার কি! তুমি চুপ করে শুয়ে থাক ব্রতু।" হাত পাখা সজোরে চালায় সরযূ "একটু ঠাণ্ডা জল খাও লক্ষীটি তার পর ঘুমোও আমি বসে বাতাস করি ভয়কি?"

মাতার নিকট অভয় পাইয়া ক্লান্ত সুব্রত নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু অভয় দাত্রী ডুবিয়া যায় বিশবাঁও জলের গভীরে, বাজে তাড়িত পক্ষিশাবকের মত ভীত বিপদ গ্রস্থ পুত্রের করুণ মুদিত নেত্রের প্রতি চাহিয়া আকুল হইয়া উঠে সরযূ—কি করিবে? সত্যই এখন সে কি করিবে? বড়দি, মেজদি, ওলের ডালনা সব বিস্মরণ হইয়া যায়, মনের উদ্বেল দুঃশ্চিন্তা কেবল সঞ্চালিত হইয়া পড়ে হাতের পাখাটিতেই, বাতাসের ঝড় বহিয়া যায়, ভীত ক্লান্ত সুব্রতর ঘর্ম্মাক্ত কলেবর তাহাতে স্নিগ্ধতা লাভ করে।

কত দুঃখে, কত শ্রমের বিনিময়ে সরযূ সুব্রতকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে কে বুঝিবে তাহা? দুঃখিনীর বেদনা বুঝি এতদিন সরযূ অনাথের নাথ বলিয়া যাঁহাকে ডাকিয়াছে তিনিও বুঝেননা, রুদ্ধ বুঝি তাঁহারও হৃদয়—দুয়ার দুঃখীর জন্য, বৃথা ডাকিয়াছে আজ বিশ বছর সরযূ সুব্রতর জন্য। অভিমানের তুফান গর্জিয়া উঠে বুকের ভিতর, ফাটিয়া বাহির হইতে চায় তাহা, মানুষের হৃদয়, বিশেষ করিয়া সরযূর হৃদয় পাষাণ

হইতেও কঠিন—বুঝি তাই জল হইয়া গলিয়া পড়ে দুটি নয়ন হইতে ধারায় ধারায়।

রুক্ষ কণ্ঠ বাজিয়া উঠে সুমতির। "আদর কাড়িয়ে মা, মা, করে ডেকে হাওয়া খাওয়া হচ্ছে দিদিকে বলবো এবার ফ্যান করে……" চমকিয়া সরযূ ছুটিয়া যায় দুয়ারের কাছে "চুপ কর মেজদি তোমার পায়ে পড়ি।" দুপা ঢুকিয়াছিল সুমতি হঠাৎ নজর পড়ে পিকদানীটার প্রতি "এঁ্যা কি সর্ব্বনাশ! এই কাণ্ড লুকিয়ে রেখে আমাদের সর্ব্বনাশ কোরছ তুমি? তুমি বজ্জাৎ, মিটমিটে শয়তান সব জানতাম, কিন্তু এত বড় পাঠাল্লা বুক তোমার তাতো জানতাম না! নিজের সর্ব্বনাশ ত ডেকে এনেছো আবার তাই লুকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করবার ফন্দি? তুমি সব পারো! বলি ওদিদি! শুনে যাও গো দেখে যাও! ছোট গিন্নীর কীর্ত্তি দেখে যাও—এখুনি এর বিহিত চাই"—উচ্চ কণ্ঠে সোর গোল তুলে সুমতি, সরযূর অনুনয় বিনয় মিনতি ভাসিয়া যায় সে চিৎকারে। চোখ মেলিয়া ভীত দৃষ্টিতে তাকায় সুব্রত মাথার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা মাখা আদেশ দেয় সরযূ "আমার কথা শোন ব্রতু! এদের হৈ-চৈ তে উদ্বিগ্ন হ'লে তোমার রোগ বাড়বে, তখন সত্যই বিপদ আসতে পারে, তুমি বড় হ'য়েছ সবত বোঝ! লক্ষ্মীটি মানিক—আমার, তুমি নিশ্চিন্ত শান্ত মনে চোখ বুজিয়ে পড়ে থাক কিছু ভেবনা আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো!"

"বেশ! শক্তিশেল একা তুমি সহ্য কর মা! আছে

তোমার সে ক্ষমতা আমি জানি” ক্লান্ত নয়ন মুদিত করে সুব্রত। আততায়ীদের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না সরযূ। একমনে চালাইয়া যায় আপনার বীজনরত হাতখানি। অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া যায় ততক্ষণ প্রভাবতী “হল কি মেজবৌ? বলি এত চেঁচাচ্ছিস কেন?” “চেঁচাব না?” কণ্ঠস্বব আরও সপ্তমে তুলিয়া সুমতি উত্তর করে “চেঁচাব না? হ’তে বাকী আছে কি অা’র তাই জিজ্ঞাসা কর! যক্ষা রোগী পুষছ বাড়ীতে কিনা! আব বল হযেছে কি? ছেলেকে সোহাগ করে মাগী ঘটোপটো হয়ে হাঁড়ি হেঁসেল একাকাব করছেনা? বাড়ীর কেউ আর বাঁচবে—ভেবেছ? এখুনি ঝাঁটা মেবে দূব কর আপদ, না করোত আমি এবাড়ী আর জলস্পর্শ কোববনা বলেদিচ্ছি। আমার কচি-কচি—বাচ্চাবা। হায়! হায়! এই দূষিত হাওয়ায় কি সব্বনাশই না এ্যাদ্দিন কবেছি”—সোর-গোলে সেখানে হাজিব হইয়া যায় দাসী ধর্ম্মর মা—খানসামা যদু, প্রভাবতীর ছোট ছেলে বিমল. দরজায় উকি দিয়া প্রত্যেকেই ঝাঁপ দিয়া বাহিরে পড়ে সোর গোল বাড়িয়াই চলে বোঝা যায়না সুব্রত নিদ্রিত না জাগ্রত, বোঝা যায়না—সরযূ জীবন্ত মানুষ না কলের মানুষ নিস্পন্দ দেহের মধ্যে শুধু হাতখানাই আন্দোলিত হয় এক ভাবে—একতানে।

অতি শৈশবে জন্মের পরই মাতৃহীনা সরযূর জন্য বিধাতা কখনও সুখ লেখেন নাই, সামান্য কয়েক বৎসর পিতা পিতামহীর সামান্যতম স্নেহ-স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু সে

বেশী দিন নহে। গাঢ় দুর্ভাগ্যে সরযূকে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহারাও চলিয়া গিয়াছিলেন বড় শীঘ্র। পিতৃ-মাতৃহীনা, সম্পদ সহায়হীনা সরযূ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অঙ্গের ভূষণ জানিয়া—পরিশ্রমকে বাঁচিবার সম্বল মানিয়া, ছিন্নবস্ত্র কদন্নকে আপনার প্রাপ্য মনে করিয়া কুমারী জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। রুগ্ন, পরানুগৃহীত একটি পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া অভিভাবকেরা অবশেষে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ছিল।

চির রুগ্ন সুব্রতর পিতা ভ্রাতাদের ফায় ফরমাস খাটিয়া ভ্রাতাদিগেরই সংসারে দিনাতিপাত করিতেন। এমন কিছু রোগ ছিলনা অথচ সবই ছিল—জ্বর, কাশি, আমাশা, অর্শ—কিনা ছিল! তাও ত বেশ বাঁচিয়া ছিলেন—ত্রিশটি বছর পর্য্যন্ত! সরযূর অদৃষ্টে জড়িত হইয়াই তিনি যমরাজার নজরে পড়িলেন নহিলে অমন একটা অকেজো—রুগ্ন পরাশ্রিতের প্রতি যমরাজের সুদৃষ্টি পড়িতে যাইবে কেন?

ইহা সকলেই বলিত! সরযূরও স্পষ্ট ধারণা।

সুব্রত তখন এক বৎসরের ছেলে। শত দুঃখ যন্ত্রণার ভিতরেও তাহার মুখ দেখিয়া সরযূ বুকে বল সঞ্চয় করিত। কাকাদের গলগ্রহ না হইয়া, স্বামীর ভাই ভাতৃজায়াদের সেবা করিয়া বাস করিতেছে স্বামীরই ঘরে—সুব্রত মানুষ হইতেছে তাহার পিতৃ ভিঠায় ইহাতেও তাহার তৃপ্তি ছিল। সুব্রত মানুষ হইতেছে—মানুষ হইয়া একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াইবে

সব দুঃখের অবসান হইবে সেদিন—, আশার কুহকিনী মায়ার জাল বুনিয়াছে সরযূ দিনের পর দিন।

জন্মের পর হইতে অশ্রদ্ধা অভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ক্লান্ত হয় নাই—সন্তানের মুখ চাহিয়া করিয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ আশা।

জননী যাহাকে কোলে লয় নাই, পিতা যাহাকে যত্নে মানুষ করেন নাই, স্বামীর স্নেহ সাহচর্য্য যাহার জীবনে লাভ হয় নাই, সংসারে যে পায় নাই কোনও বন্ধু, কোনও নিকটতম আত্মীয় সেই অভাগিনী জীবন বহন করিয়াছে এ দীর্ঘ দিন শুধু ছোট্ট একটি শিশুর মুখ চহিয়া, আশাতরু সঞ্জীবিত করিয়াছে তিলে তিলে তিল তিল করিয়া মানুষ হইবার পথে প্রেরণা যোগাইয়াছে সরযূ সুব্রতর। মানুষ প্রায় হইয়াও উঠিয়াছে আর দু-তিনটি বৎসর···নাগ মাতার দাসীত্ব হইতে বিনতার মুক্তি মিলিবে, একটি একটি করিয়া দিন গনিয়া চলিতেছিল সরযূ—সুব্রতর বাইশ জন্মতিথি পার হইল। মধুসূদন, হরি, অনাথের নাথ মুখ তুলিয়া চাহিও, শয্যাত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করে সরযূ পুত্রের কুশল, আহ্নিকে বসিয়া কামনা করে পুত্রের ভাগ্য, যশ, সুখ, সৌভাগ্য—সন্ধ্যার প্রণতিতে ফুটিয়া উঠে তাহার সন্তান প্রীতি—তুলসীতলার মাটি লইয়া সুব্রতর মাথায় না বুলাইয়া অন্য কাজে হাত দেয় না—সরযূ। শয়নের পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকে দীনবন্ধু, দয়াময় হরিকে, একমাত্র সরযূর একটিই স্নেহের ধন, সমস্ত বুকের রক্ত নিঙড়াইয়া মানুষ করা সুব্রতর জন্য।

কঠিন ব্রত, দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত সরযূর সফল প্রায়, সমাপ্তির শেষ সোপানে আরূঢ়। সুব্রত জলপানি পাইয়া আই, এ, বি, এ পাশ করিয়াছে—এম, এ পড়িলেই শেষ, আর দুটি বৎসর—পরে এ-বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে পালাইবে সরযূ সুব্রতকে লইয়া শান্তির নীড় বাঁধিবে ছোট্ট একটু। বিশ্রাম লইবে বধূর হাতে সে নীড রক্ষার ভার দিয়া, সুব্রতর সন্তান হইবে, সুব্রতর বধূ, সুব্রতর সংসার আশার তরণী পাল তুলিয়া ছুটাছুটি করে সরযূর হৃদয় ফল্গুর গুপ্ত ধারায়। নিশিথ স্বপনে খেলিতে দেখে সরযূ সুব্রতর বধূর ক্রোড়ে ছোট্ট সুব্রতকে। জাগিয়া সস্নেহ চুম্বনে ভরিয়া তুলে পুত্রের ললাট। তৃপ্ত ক্লান্তিহীন মনে ঘুরাইয়া চলে বিরাট সংসার চক্র, সম্মুখে শান্তি পারাবার! হায় আশা! হায়রে কুহকিনী মায়া! হায় দুর্ভাগিনী জননী!

(৩)

"বলি হ্যাঁগা ও ছোট বৌ, ধ্যানস্থ হয়েই ত বসে আছ—কানে যাচ্ছেই না আমাদের কোন কথা। তা বলি উঠে এসো, ঠিক দুপুর বেলা মানুষেরা সব খাবে দাবে" হাঁপাইয়া পড়ে প্রভাবতী বেশী কথা বলিতে জানেনা, শানানো গলা; উপস্থিত বুদ্ধি চিরদিনই বেশী সুমতির। ঝগড়ায় চিরকাল সুমতিরই জয় হইয়াছে প্রভাবতী শুধু বকিতেই পারে ছন্দ ঠিক রাখিতে পারেনা—কথার।

মুখের কথা কাড়িয়া সুমতি উত্তর করে—"কি যাতা বলছ দিদি! ওর হাতে এখন খাবে কে? না জেনে যা হবার হ'য়েছে তাই বলে আর না! ওই সর্ব্বনেশে রোগ ঘেঁটে ও হেঁসেলে ঢুকবে?"

"তাহলে উপায়?" অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া তাকায় প্রভাবতী "এখন এত লোকের রান্না করে কে? আমার ত বড্ড মাথা ধরেছে।" অন্য সময় হইলে সুমতির সহিত ইহাতেই বাধিয়া যাইত প্রভাবতীর। কিন্তু বিঁধিবার পাত্রী সম্মুখে হাজির—সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে জবাব দেয় সুমতি "তা আর কি হবে বল! এ বেলাটা নেব 'খন আমি চালিয়ে। তোমার ত শরীর ভালই না জানা কথা—জলে চপচপে শরীর দেখতেই যা, পদার্থ আছে কি আর কিছু। আর নন্দনকে হাঁসপাতালে দিক সব এসে, তখন নেয়ে ধুয়ে ছোট বৌ-ই আগের মত সব পারবে।"

অপরাধীর মত দাঁড়ায় সরযূ—"মেজদি তোমরা এখান থেকে যাও—ব্রতু একটু ঘুমুতে পারে নিরালা হ'লে, শ্যামল অসুক বট্‌ঠাকুর আসুন—যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে এখন তোমরা যাও।"

"হ্যাঁ চলগো দিদি নবাব পুত্তুর ঘুমুবেন চল"। সকলেই—চলিয়া যায় আপন আপন ধান্দায়। সকলের শেষে দুটি আতবান্ন পাক করিয়া আহার করে সরযূ, রোজকার মত পারেনা তাহা—ডাকেওনা কেহ, উপবাসে বসিয়া থাকে সরযূ পুত্রের শিয়রে।

মাঝে মাঝে অস্ফুটে ডাকিয়া উঠে দীনবন্ধু অনাথের নাথ দয়া কর—দয়া কর কাঙ্গালিনীকে! নীরবে স্নেহ দৃষ্টি বুলায় সুব্রতর সর্ব্বাঙ্গে। কবে কোন কালে শুভদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন গান্ধারী দুর্য্যোধনের পানে তাই কোন অস্ত্র বিঁধে নাই তাঁহার শরীরে। উলঙ্গ হইয়া আসিতে লজ্জা বোধ হওয়ায় বস্ত্রে যেটুকু অঙ্গ ঢাকিয়াছিলেন সেইটুকু, সেই উরুভঙ্গে মহামানী দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল, মায়ের শুভদৃষ্টির বর্ম্ম ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই তাঁহার শরীরের আর কোনও স্থানে কোন অস্ত্র!

হায় দুঃখিনী! তোমার দৃষ্টিতে কেমন করিয়া ঝরিবে সে অমৃত! প্রলেপের মত মাখিয়া সুস্থ হইবে সন্তানের জ্বরতপ্ত দেহ! সুব্রতর ক্লান্ত, পাণ্ডুর দেহের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সরযূ হাতড়াইয়া বেড়ায় মনের মণি কোঠায় উপায়! উপায়! উপায়! যে কোন উপায়ে যে কোন মূল্যে সুব্রতকে বাঁচাইতে চাহে সরযূ!

অদৃষ্টের সহিত শেষবারের মত লড়িতে ইচ্ছা তাহার—অদৃষ্ট কেমন করিয়া কড়িয়া লয় দেখিবে সে—দিবেনা—সুব্রতকে এ-জগৎ হইতে বিদায় লইতে দিবেনা সরযূ। কিন্তু! আকুল হইয়া পড়ে সে কেমন করিয়া পাইবে অর্থ! অর্থ, শুধু অর্থ নহে প্রচুর অর্থ, কেমন করিয়া কোন পথে তাহা পাওয়া যায়? কত অর্থ আছে চতুর্দ্দিকে, চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেই দেখা যায় প্রচুর সমারোহ। কিন্তু মানুষকে বাঁচাইবার প্রয়োজনে তবে কোন পাওয়া যায় না তাহা?

কত হীরা জহরত বড় ঘরানার সর্ব্বদেহে; আরো কত সঞ্চিত থাকে তাহাদের চাবীবন্ধ সিন্দুকে। কত টাকা ব্যাঙ্কে, শুনিয়াছে সরযূ সে টাকা গণিয়া শেষ করা যায় না—ওজন করিয়া জমা করিয়া লয় কর্ম্মচারীরা। হায়! হায়! সরযূ কি পাইবেনা কয়েক মুষ্টি টাকা! সরযূর চোখের আলো দেহের জীবন, একমাত্র ধন—সুব্রতকে বাঁচাইতে দিবে কি কেউ? কোনও দয়াবতী দানশীলা মহিমা, কোন সদাশয় ব্যক্তি। কেউ! কেউ! কেউ কি দিতে পারেনা সরযূকে! টাকা! টাকা। টাকা! সরযূর চোখের সম্মুখে সবকিছু বিলীন হইয়া যায়—ফুটিয়া উঠে ফুলের মত শুভ্র রজত খণ্ড। টাকা! টাকা! তাহারি নাম টাকা! সেই টাকার সমষ্টিতে বাঁচিতে পারে সুব্রতর জীবন!

সেই টাকায় সংগ্রহ করা যায় দুধ-ফল-মিস্টান্ন! কত আছে বাজারে, দোকানে বাজারে জীবন ধারণের প্রচুর উপাদান—সুসজ্জিত। কিন্তু! কিন্তু সংগ্রহ করিতে চাই টাকা—। উত্তেজনায় উপবাসে দেহ কাঁপিতে থাকে, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করিয়া উঠে এলোমেলো ভাবনার ছন্দ ঠিক থাকেনা—

টাকা! শুভ্র রজত খণ্ডের মরীচিকার মধ্য হইতে বড় বিরক্তি-কর একখানা মুখ ভাসিয়া উঠে—পাশের বাড়ীর উচ্ছৃঙ্খল বদখেয়ালী প্রাণকৃষ্ট বাবু! জানালা খুলেনা সরযূ, ভ্রমক্রমে কখনও জানালা খুলিলেই চোখে পড়িয়াছে সেই লুব্ধ দৃষ্টি!

অনেক টাকা আছে ওর! মস্ত বাড়ী, মস্ত গাড়ী, নাচ গান

হৈ হল্লা লাগিয়াই আছে বাড়ীটাতে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত শুনিতে পায় সরযূ ইয়ার বন্ধুর উচ্ছৃঙ্খল মাতলামীর প্রলাপালাপ। তারি মাঝে সুসংলগ্ন প্রাণকৃষ্টবাবুর দু-একটি বাক্য—"ওরে বেন্দার পিসিকে দিয়েছিস মাসোহারার টাকাটা! হরিপদ বড্ড কান্নাকাটি করছে মেয়ের বে, সরকার মশায়কে বল পাঁচশো টাকা দেবে। যা-যা নাকে কাঁদিসনা পাঁচু সরকার মশাইকে বলগে কিছু দেবে।" হো-হো করিয়া হাসিয়া আপনাকে আপনিই বলিয়াছে তারপর—"যা শালা মাতাল—বাপের টাকা উড়ো দুহাত দিয়ে। এই হরে! বুক চড় চড় করছে! ভাবছিস বাজে যাচ্ছে? আরও দু বোতল খেলে হ'ত! খবরদার তা ভাববি না—বাবা ব্যাটা টাকা করে গেছে উপযুক্ত ছেলে আমি দান ধ্যান করবোনা? খা শালা তোরাও খা বাবা মাধু এনে দেতো আরো কটা বোতল"—অবাক হইয়া ভাবিয়াছে সরযূ এত দান করে এত মদ খায় তবুও টাকা ফুরোয়না? কত টাকা করিয়া গেছে উহার বাবা?

ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসে সরযূ—যাইবে প্রাণকৃষ্ট বাবুর কাছে? এখনও সুমতি প্রভাবতী দিবানিদ্রায় অচেতন—যাইবে সরযূ চুপে চুপে! চাহিবে দুহাত জোড় করিয়া? ভাবিতে পারেনা আর সরযূ, ভাবনার গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহার। বাহির হইয়া পড়ে পথের উপর, ঢুকিয়া পড়ে পাশের বাড়ীর গেটের ভিতর, অবারিত দ্বার সকলের পক্ষেই, কেহ শুধায় না কাহাকে চাই? কেন চাই। সোজা-

সুজি চলিয়া যায় সেই ঘরে যে ঘরের প্রতিটি কথা—প্রতি কাজ সে আপনার রুদ্ধ জানালার অন্তরাল হইতে নিত্য শুনিতে জানিতে পায়, হতভম্ব সরযূর প্রতি চাহিয়া নির্ল্লজ্জ ভাবে হাসিয়া উঠে প্রাণকৃষ্ট "জানতাম, আজকের সব কথাই শুনেছি —তুমি আসতে পার তা আগেই ভেবেছি।"

জানিত! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা ত লোকটার, মনে হয় সরযূর উহার ওই আকর্ণ বিস্তৃত হা করা মুখে একটা চড় বসাইয়া দেয়!

কিন্তু! না না মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠে তাহার জীবন সর্ব্বস্ব ব্রতুর জ্বর তপ্ত শুষ্ক মুখ। যে কোন পথে যে কোন উপায়ে— যে মূল্য চাহিবে প্রাণকৃষ্ট দিবে তাহা সরযূ, টাকা চাই—পরিবর্ত্তে চাই অনেক টাকা, ভালো খাবার ভালো ঘর ভালো ওষুধ— আলো বাতাস. জানে সরযূ শুধু চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা সুব্রতর রোগ আরোগ্য হইতে পারেনা—চাই টাকা!

(৪)

তাহার জন্য মান, সম্ভ্রম, ঘৃণা লজ্জা কিছুই রাখিবেনা সরযূ, প্রয়োজন হইলে সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া কিনিবে সে সন্তানের আরোগ্য, সম্বরণ করিয়া লয় মূহূর্ত্তে সে আপনার ঘৃণা বিতৃষ্ণাকে পরম আত্মীয়বোধে বিনীত কণ্ঠে উত্তর করে—"আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি! আপনি দাতা, মহানুভব!

আমি ভিক্ষা চাই! আমার ছেলের জীবন সংকট। আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে এসেছি।”

“হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ” হাসিয়া উঠে প্রাণকৃষ্ট “তুমি! তুমি চাইলে দেবনা? তোমাকে অদেয় আমার কিছু আছে কি! কত! কত টাকা চাই?” কলম তুলিয়া চেক বই টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করে সে।

আবার রি রি করিয়া উঠে সরযূর সর্ব্বদেহ ঘৃণায়—ক্রোধে। কিন্তু না—না! ওইত! ওই লোকটাই বাঁচাইতে পারে তাহার ব্রতুকে! সরযূর নিকট ও এখন দেবতা, সঞ্জীবনী মন্ত্র উহারি হস্তে মুহূর্ত্তের মধ্যে বসিয়া পড়ে সরযূ প্রাণকৃষ্ণের পায়ের নিকট কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়—“শুধু টাকা নয়, আপনার আশ্রয় চাই আমি, আপনার কি বোন ছিলনা? মা? তাঁদের কথা স্মরণ করে দয়া করুন আমাকে বড় অভাগী আমি”—রুদ্ধ হইয়া যায় সরযূর কণ্ঠ, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকে প্রাণ কৃষ্ণের মুখের পানে ভক্ত যেমন তাকাইয়া থাকে আপনাব আরাধ্যের মূর্ত্তির দিকে—।

হোহো—করিয়া হাসে প্রাণ কৃষ্ণ, “বড় কঠিন তোমার চাওয়া! তুমি খুব বুদ্ধিমতী ঃ বরাবরই জানি আমি তা! তুমি জলেও ডোব না আগুনেও পোড়না এমনি তুমি কঠিন! আমি জানি! তোমায় আমি খুব জানি! কিন্তু তুমি যে আমার বাড়ী আশ্রয় চাইছ আমার মা বোনের দোহাই দিচ্ছ—আমি না হয় মা বোনের কথাই মনে করে আশ্রয় দেব—

কিন্তু! লোকে শুনবে কেন? আমার মত বাউরো বোম্বেটে মানুষ মা বোন নেই বিয়ে করিনি। আমার মত লোকের আশ্রয় নিয়ে তুমি যদি ঘর ছাড় লোকে তোমায় ক্ষমা করবে কেন? বিশেষ করে যাদের বাড়ী দাসীবৃত্তি করচ তারা? বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনার ঝড় বইবে দুর্ণামের কালী তোমার সর্ব্বাঙ্গে লেপে যাবে। পারবে তুমি সেই ঝড়, ঝাপটা, কালি কলঙ্ক উপেক্ষা করে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছেলের শুশ্রূষা করতে?"

"আমি? আমি সব পারব। আমি পারব সব গঞ্জনা সহ্য করতে। আমার ব্রতুর মুখ চেয়ে সব পারব আমি, আপনি শুধু দয়া করে আশ্রয় দেবেন যৎটুকু প্রয়োজন তার বেশী অর্থ-ও আমি চাইব 'না, দাসী হয়ে রইব চিরদিন আপনার বাড়ীতে,—শুধু ব্রতুকে বাঁচাবার উপায় করে দিন" ব্যকুল কণ্ঠে উত্তর করে সরযূ।

কুটিলতার হাসি নহে অশ্লীল হাসি নহে আবার হাসিয়া উঠে প্রাণকৃষ্ণ হা-হা করিয়া সরল প্রাণ খোলা হাসি, "বোন কি দাসী হ'য়ে বাড়ী থাকে? জাননা নিমাই পণ্ডিত কি বলেছিলেন? ব্রাহ্মণের পৈতে থাকে বুকে—আর বিধবা বোনের স্থান মাথার উপরে। ভায়ের বাড়ী মনে করেই এসো মাথায় করে রাখব তোমায়! লোকের কথা, থোড়াই কেয়ার করি আমি, আমি ভাই তুমি বোন! জাননা স্বামীজী কি বলেছিলেন? জানবেই বা কেমন করে! বই টই তোমায়

এনে দেবেই বা কে। হ্যাঁ, স্বামীজী বলেছিলেন—আমেরিকায় গিয়ে ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ অর্থাৎ সব মানুষ সব মানুষের ভাই এবং বোন! আর কি হাততালিই না পড়েছিল—বড় বড় হোমরা চোমরা মেম সাহেব হাত তালি দিয়েই হাত ব্যথা করে ফেলেছিলো। দেখছ না মাতাল হই আর যা হই ভদ্র লোকের ছবিটা কেমন বড় করে ঘরে রেখেছি? বড় ভালো ছিলেন ভদ্র লোক। আর কিছুদিন বাঁচতেন যদি তা এই রোগ বালাই মূর্খমী দেশ হতে দূর করে যেতে পারতেন। তোমাকে আর ভুগতেই হতনা ছেলের অসুখ নিয়ে। যাক্ যাও—যাও ছেলে নিয়ে এসোগে কিছু ভয় কোরনা—কিছু ভেবনা প্রাণকৃষ্ণ ঘোষালের বোন তুমি আজ থেকে, তোমার মান সম্মানের ভার আমার।" সরযূর অশ্রু সাগরের বাঁধ ভাঁঙ্গিয়া জল বহিতে থাকে নয়ন দিয়া, রুধিতে পারেনা—ধন্যবাদ দিয়া ছোট করিতে পারেনা ধন্যবাদের ভাষাও হারাইয়া যায়—। নীরবে বাহির হইয়া পড়ে পথে। যেমন আসিয়াছিল তেমনি নীরবে আবার ফিরিয়া যায় আপনার ক্ষুদ্র কক্ষের দরজায়।

(৫)

দ্বিতীয় বার সোরগোল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ততক্ষণে। সোরগোলের মাত্রা দ্বিপ্রহর হইতে অনেক বেশী।

কলেজ হইতে ফিরিয়াছে ভাসুর পো শ্যামল, অফিস হইতে বড ভাসুর, মেজ ভাসুর ও তাঁহার শ্যালক, বাড়ীর বাসিন্দা কেহই বাকী নাই সুব্রতর দরজায় আসিতে, রাত দুপুরে চোর পালাইয়া গেল—গেলে পর যেমন জটলা আরম্ভ হইয়া যায় গৃহস্থ বাড়ী—আগে কে চোর দেখিল, কে বা চিৎকার করিল ধরি ধরি করিয়াও কাহার হাত ফস্কাইয়া গেল—এই সব লইয়া যেমন আলোচনার সৃষ্টি হইয়া থাকে তদপেক্ষা অনেক-গুণ অধিক জল্পনার জাল বুনিতেছে বাড়ীর সকলে, জামা জুতা পর্য্যন্ত খুলিবার অবসর কাহারো হয় নাই।

কে আগেই বুঝিয়াছিলেন ওর মড়ীখেকো চেহারা দেখিয়া, ওর শান্ত শিষ্টতা যে নির্জ্জীবেরই নামান্তর ইহা আগে অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া তর্কের অন্ত নাই। যে আগে কিছু অনুমান করিতে পারে নাই—পরে কি হইবে, কি কি ঘটিতে পারে করিতেছে তাহারি আনুমানিক আলোচনা। সরযূকে দেখিয়া সামান্য একটু সন্ত্রস্ততা দেখা যায় সকলেরি মধ্যে। দাস দাসীরা আপনাপন কর্ম্মে চলিয়াও যায়, শরাহত জীবিত পক্ষীশাবকের মত মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর ভীত সন্ত্রস্ত পুত্রের মস্তক অঙ্কে তুলিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়ে সরযূ।

আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠে সুব্রত "কি হবে মা, কি করবে তুমি ?—"

"চুপ কর ব্রতু! আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। কোন ভয় নেই তোমার!" আশ্বাস দেয় সরযূ।

দরজার নিকট আগাইয়া দাঁড়ায় বড়জা—প্রভাবতী—“বলি হ্যাঁ গো ও ছোট বৌ, উঠে এসোনা—আপিসের কাপড় ছাড়তে পাননি সেই কাল হতে, গেছিলে কোথায়? কই গো বলে দাওনা ঘাটের মড়াকে পাঠাতে হবে কোথায়, “ছিঃ মা,” আগাইয়া আসে শ্যামল মিষ্ট কণ্ঠে সম্বোধন করে সরযূকে—“বলছিলাম কি কাকীমা! এই ব্রতুকে পাণ্ডিপুকুরে দিয়ে দিই—ওখানে একজন চেনা লোক আছে আমাদের নিয়ে নেবে এক্ষুনি। ছোঁয়াচে রোগ! বুঝতেই ত পারছ বাড়ী রাখা নিরাপদ নয়, ফোন করি সে ভদ্রলোককে কি বল?”

শ্যামল ছেলেটি ভাল। সরযূ হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে তাহাকে—অবশ্য কাকীমার মর্য্যাদায় নহে দাসীত্বের দাবীতে সেবা লইয়াছে শ্যামল। তবু মিষ্ট কথা, সদয় ব্যবহার যাহা কিছু পাইয়াছে সরযূ তাহা শ্যামলেরি নিকট হইতে!

শ্যামলের অনুরোধেই ভাসুর সুব্রতর কলেজের মাহিনা জোগাইয়াছেন—সেই শ্যামলও অবশেষে—বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে সরযূর হৃদয়, পঁচিশ বৎসরের দাসীত্বের কি কোনও পুরস্কার নাই? হায় ভগবান! না—না—না—ভগবানকে জানাইবেনা সরযূ, উহাদের কোনও দোষ নাই, অজ্ঞ অশিক্ষিত এ পোড়া দেশে যক্ষার নাম দেওয়া হইয়াছে—শিবের অসাধ্য ব্যাধি কাল ব্যাধি! যক্ষা হইলে রোগীকে সারাইবার প্রচেষ্টা অপেক্ষা—রোগীকে ত্যাগ করিবার বাসনাই এদেশের লোকের অধিক, এধারণা শিক্ষিত সমাজেও বর্ত্তমান! উহাদের দোষ কি?

মিষ্ট কণ্ঠেই জবাব দেয় সরযূ—"একথা আমিও ভেবেছি বাবা! তাইত বেরিয়ে ছিলাম। একটা চাকরী ঠিক করে এলাম, ব্রতুকেও রাখবে তারা, তোমরা ব্যস্ত হ'য়োনা। হাঁসপাতালে দিলে অবশ্য মন্দ হ'তনা তা আমি আগে ভাবিনি, তা যাক ওকে ছেড়ে স্বস্তি পাবনা, বরং কোন সারিয়ে তুলে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাব তোমরা ব্যস্ত হ'য়োনা—যাও কাপড় চোপড় ছাড় গে—আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে প্রভাবতী—পঁচিশ বৎসর সেবা লইয়াছে সে একাদিক্রমে সরযূর,—দেহ অথর্ব্ব হইয়াছে, রসনা বিগড়াইয়া গিয়াছে,—এখন উপায়, সুমতির যাহা যোগ্যতা তাহা আর জানিতে বাকী নাই। সরযূ চলিয়া গেলে সর্ব্বদা বিঁধিবার লোক না পাইয়া বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে প্রভাবতীকেই, দাস দাসীরা তাহার ব্যবহারে এমনিই নিত্য কাজ ছাড়িবার ভয় দেখায়, তাহা হইলে ত আর রক্ষাই থাকিবে না।

আঁকু পাকু করিয়া বলে প্রভাবতী—"ওমা বাড়ীর বৌ তুমি কোথায় যাবে? লোক হাসবে না তুমি চাকরী করতে বেরুলে? অসুখ হয়েছে হাঁসপাতালে দাও, ভগবান না করুন ভালমন্দ না হয়ত সেরে বাড়ী আসবে।"

ভাসুর আর স্বামীর উপস্থিতিতে মেজ বৌ সুমতির রসনা গুমরাইয়া মরিতেছিল, তাহার উপর এলোমেলো ছন্দে বড়জার

কথাগুলি খোসামোদের মতই শোনায়, ভাসুরের সম্মান রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

মুখ হাসাবার জন্যই ত ওসব ঢং দিদি, তা আর বোঝনা? তা নইলে বলে শিবের অসাধ্য রোগ, বলে যার নাম ক্ষয় কাশ, তাই উনি সারাবেন? আরে! সারাবি ত দে-না হাঁসপাতাল আছে ফেলে দে সেখানে।

"তা নয় গো! তা নয় উনি এবার উড়বেন ডানা বের করে"— আর একটু আগাইয়া আসে সরযূ। ভাসুরদের সম্মান রাখিয়াই চাপা কণ্ঠে শ্যামলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে,—"তোমরা এখান থেকে যাও, শ্যামল। ডাক্তারী পড়ছ, জানত—রোগীর সামনে তার রোগ সম্বন্ধে একরকম আলোচনা তার পক্ষে কতখানি অনিষ্টকর? আমি কথা দিচ্ছি এখুনি চলে যাবো তাতেও আবার কেন তোমরা দাঁড়িয়ে হাঙ্গামা করছ?"

নিপীড়িতা সরযূর কণ্ঠে যে কোন ভাষা আছে তাহা কেহই জানিতনা, চমকাইয়া উঠে সকলে—মৃদু অথচ কণ্ঠের সুস্পষ্ট উচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া।

পঁচিশ বৎসরের বন্দীজীবনের কারাগার! তবু চক্ষে জল আসে সরযূর, আসবাবপত্রহীন জীর্ণকক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে পড়িয়া ফেলে সে মমতার লিখন।

সুব্রতর পিতার ঘর! একতলার স্যাঁৎ সেঁতে ঘরখানি। ছেঁড়া দুটি বিছানা—জীর্ণ শীর্ণ একটি বাক্স, সুব্রতর পিতার

সম্পত্তি! ছাড়িয়া যাইবার নামে সরযূর হৃদয় বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে!

কিন্তু! না, না! এঘরে, এ পরিবেশে সুব্রত ত বাঁচিতে পারে না। থাকিতেও দিবে না ইহারা এ ঘরে সুব্রতকে, তবে!

মানের বালাই লইয়া একা পড়িয়া থাকিবে সরযূ এ ঘরে? যাহারা মান রাখিল না, রাখে নাই কোনও দিনও—তাহাদের মান রক্ষার জন্য সন্তানকে—বিসর্জ্জন দিবে? অসম্ভব তাহা!

জননীর কাছে সন্তান—বিশেষ করিয়া সরযূর কাছে সুব্রত সব সুখ দুঃখের, মান অপমানের বহু উর্দ্ধে—তাহার কল্যাণ কামনাই সরযূর একমাত্র ধর্ম্ম। মান, ধর্ম্ম, সুখ কিছুই নাই সরযূর সুব্রতকে বাদ দিয়া।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনার দেহের উপর সমস্ত ভার লইয়া সুব্রতকে হাঁটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে সরযূ পথে। গৃহের অধিবাসীরা আপনাপন কক্ষে তখন বিশ্রামে মগ্ন হল্লা জটলা করিয়া কেহই পিছু লয় না বিরক্ত করে না।

ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে সুব্রত "কোথা নিয়ে যাচ্ছ মা আমাকে?"

উত্তর দেয় সরযূ—"যেখানেই যাই না ব্রতু তা তোমার ভালর জন্যে। তোমাকে আরোগ্য করাই আজ হ'তে আমার একমাত্র সাধনা হবে! আমার ওপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে শুধু আমার আদেশ পালন করে যাও—দেখো নিশ্চয় সেরে উঠবে!"

আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই সুব্রত—জিজ্ঞাসা করার মত সামর্থ্যও তাহার ছিলনা—

প্রাণকৃষ্ণকে বিশ্বাস করিতে ভরসা হয়না সরযূর! মাতাল মদের ঝোঁকে বোন বলিয়াছে আবার হয়ত মদের ঝোঁকেই অপমান করিতে ছাড়িবেনা—সংকোচে, ভয়ে পা বাধিয়া যায়, সুব্রতকে বহন করিয়া যেন চলিতে পারেনা সে। কিন্তু পথে বাহির হইয়াছে, ফিরিবার উপায় নাই—আর ফিরিবেই বা কোথায়?

প্রবৃত্তি শত কণ্ঠে না না করিয়া উঠে, কিন্তু আপনার মর্য্যাদা চাহিয়া হত্যা করিবে সে সন্তানকে? মাতৃত্বের করুণা হাসিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয় সরযূর চরণ দুটিকে।

গেটের সম্মুখেই প্রাণকৃষ্ণ।

"আপনার চাকরকে একটু ডেকে দিন না, ব্রতুকে ধরবে একটু"—নির্ভীক কণ্ঠেই বলিতে পারে সরযূ অসীম বল আসিয়া যায় তাহার বুকে।

"ধরবে কেন! এই মাধো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চেয়ার এনে বসা, তোরা চারজনে ধরে ওপরে তুলে নিয়ে যা। এসো বাবা,—আমি তোমার মামা! কোনও ভয় নেই, অসুখ তোমার সেরেই যাবে দুদিনে"—উত্তর করে প্রাণকৃষ্ণ।

(৬)

মস্ত ঘর আসবাব পত্রে ঠাসা! পছন্দ হয়না সরযূর। বাড়ীর মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সে মনোনীত করে তেতলার চিলে

কোঠার ছোট্ট ঘরখানি! মাথার উপর ছাতটুকু বাদে সবটাই প্রায় সে ঘরের খোলা—আভূমি লম্বিত চারিটি জানালা, তুইটি দরজা। নির্ম্মল বাতাস, প্রখর সূর্য্য কিরণ, স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক—সবকিছুরই অবারিত গতি সে ঘরে বুক ভরিয়া লইতে পারিবে সুব্রত নির্ম্মল বাতাসে। ত্বরিত হস্তে সরযূ ঝাড়িয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লয় ঘরখানি।

সুব্রতকে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে শোয়াইয়া মনে উদয় হয় তখন অন্য আবশ্যকের কথা।

আলো, বাতাস—নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশের যেমন প্রয়োজন, তেমনিত প্রয়োজন ঔষধ, পথ্য, ডাক্তারের। প্রাণকৃষ্ণের কাছে যাইতে আর যেন চরণ উঠেনা—জীবনে যাহা কখনও করে নাই পরপুরুষের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া করুণা ভিক্ষা হঠাৎ উত্তেজনার বশে একবার করিলেও—পুনর্ব্বার যাইতে কেমন অপরিসীম সংকোচ আসিয়া যায়। কিন্তু সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে সুব্রতর রোগ বাড়িয়া চলিতেছে তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই ত সরযূ দুরপনেয় অপমান ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে -তবে? তবে কেন সংকোচ? অন্তঃর্দ্বন্দে আকুল হইয়া উঠে সরযূ।

প্রাণকৃষ্ণের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল শুধু নহে মূল্য স্বরূপ আপনাকেও দিবার প্রতিজ্ঞায়, তবে? তবে কেন সংকোচ!

আপনাকে বলি দিয়া বাঁচাইবে সে সুব্রতর জীবন এইত প্রতিজ্ঞা। কিন্তু শুধু হাতেই ভিক্ষা সে দিয়াছে, মনুষ্য জাতির

মধ্যে এখনও সত্যকার 'মানুষ' আছে, মানুষ এখনও মানুষকে দয়া করে একথার জাজ্বল্য প্রমাণ পাইয়াছে সরযূ। তবু কেন ভয়?

আর কিসের জন্য ভয়? হে জগদীশ্বর, সরযূর সব সুখ ভোগের আশায় ছাই ফেলিয়া, রক্ষা করিয়া দাও সুব্রতর জীবন! দূর হইতে দেখিবে সে! ঘৃণা, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া—দূর হইতে দেখিবে সুস্থ সুখী সুব্রতকে! ক্লৈব্য দূর করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় সরযূ। এক নিশ্বাসে প্রাণকৃষ্ণের সামনে গিয়া বলিয়া ফেলে "একটা ডাক্তার ডাকতে হবে আর কিছু ফল, বেড প্যান পিকদানি আরও কিছু কিছু জিনিষ যা এখুনি চাই—কাউকে বলুন একটু কাগজ দেবে লিখে দিই"—

সারাদিনের উপবাস—অন্তর্দ্বন্দে সারা দিনই উত্তেজিত ও কাতর—সরযূর সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপে—কথা আটকাইয়া যায়!

স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইয়া প্রাণকৃষ্ণ উত্তর করে—"ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি, সরকার মশায় তোমার ঘরে যাবেন সব জিনিষ ফর্দ্দ করে নিয়ে এনে দেবেন, কিন্তু একটা কথা—তুমি কি কিছু খেয়েছ আজ, অথচ ছেলেকে বাঁচাতে হলে সেইটাই মূল প্রয়োজন একথাটা ভুললেই বা চলবে কেন?—"

"খেতে হবে কিছু? কিন্তু কি খাব? আমি যে নিজ হাতে নিরামিষ হবিষ্য খাই, ব্রতুকে ফেলে তাতো সম্ভব হবেনা! অসহায় করুণ শোনায় সরযূর উত্তর।

"বেশত! আমার বামন ঠাকুর আতবান্নই দুটি রেঁধে দেবে, নিজ হাতে নাইবা রাঁধলে! বোন বলে যখন ঘরে এসেছ ভাইএর হাতেই খাওয়ার ব্যবস্থা ছেড়ে দাও। নিশ্চিন্ত মনে ছেলের কাছে থাক।" কৃতজ্ঞতায় দুচোখ ছাপাইয়া জল আসে সরযূর! প্রাণকৃষ্ণ দান করিত দুহাতে তাহা জানিত, কিন্তু সরযূর অদৃষ্টে এত যে দাক্ষিণ্য মিলিবে তাহা একেবারেই ধারণাতীত!

মানুষ যে এত মহাপ্রাণ হইতে পারে তাহা দেখিয়াও প্রত্যয় হইতে ছিলনা, জলভরা বিস্ফারিত নয়নে প্রাণকৃষ্ণের কুৎসিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে কিছুক্ষণ—তার পর ধীরে ধীরে পুত্রের নিকটই চলিয়া যায়।

তাহার জ্বরতপ্ত ললাটে কল্যাণ হস্ত বুলায়—মনে মনে কাতব মিনতি জানায় মহেশ্বর, বৈদ্যনাথ, দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে।

ডাক্তার আসিয়া যান যথাসময়ে।—

গভীর মনোনিবেশে রোগী পরীক্ষা করিয়া যখন মুখ তোলেন আকুল প্রশ্ন জানায় সুব্রত—'কেমন বুঝলেন ডাক্তার বাবু?

"ভালই! তবে একটা কথা কি—ডাক্তারের সঙ্গে যদি সহযোগিতা কর তবে ভালই! আর যা বলি সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন না কর তাহলে রোগ বেড়ে যেতে পারে—এতো বুঝতেই পারছ, কাজেই আরোগ্য এখন—অৰ্দ্ধেক তোমার নিজের হাতে, অৰ্দ্ধেক ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীর হাতে!

আচ্ছা আসুন আপনার সাথে কথা কই," সরযূর প্রতি তাকান ডাক্তার বাবু।

বাহিরে আসিয়া সরযূকে বলেন—"দেখুন রোগ আমি বেশ ধরতে পেরেছি, এখন রোগের প্রথম অবস্থা, আপনি আমার নির্দ্দেশ মত পথ্যাদি দেবেন শুশ্রূষা করবেন অসুখ সেরে যাবে! একটা ফটো করতে পারলে অবিশ্যি বড় ভাল হ'ত—" সরযূ উত্তর করে—"আপনি যখন সঠিক ধরেছেন রোগ তখন আবার এই রোগীকে কষ্ট দিয়ে ফটো কি না করলে হয় না ?"

"না মা! ফটো একটা করতেই হবে—তবে তাড়াতাড়ি নেই! নতুন চিকিৎসা উঠেছে—বুকে একরকম গ্যাস দিয়ে, তার জন্য ফটো চাইই—"

"আর একটা কথা কি জানেন, আপনারাই পাঁচদিন বাদে যখন ডাক্তার বদলাতে চাইবেন—তখন সে ডাক্তার প্রথম খুঁত ধরবেন—ফটো করেছ ? ব্লাড, ইউরিন, স্পুটাম, রিপোর্ট কই ? ইত্যাদি, কাজেই আট ঘাট বেঁধে তৈরী হ'তে হয় আমাদেরি। রোগীর তাতে লাভ হোক না হোক আমাদের বিপদ ঢের কম। কিন্তু আপনি যখন বলছেন, আমারও ধ্রুব বিশ্বাস এ রোগী শীঘ্র সেরে যাবে, তখন আমিই সমস্ত দায়িত্ব নিই। তবে সম্পূর্ণ আমার কথায় চলতে হবে, পারবেন ? ছেলের কমপ্লীট রেষ্ট, পাশ ফিরবেনা অস্থির হয়ে, উঠে বসে খাবেনা, শুয়েই পায়খানা করবে, জোরে কথা কবেনা—এমন কি হাতখানা পর্য্যন্ত জোরে তুলবেনা, সর্ব্বক্ষণ কাছে বসে শোনাবেন আপান

অনুত্তেজক আরোগ্যের বাণী, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ে শোনাবেন, নিয়ম করে ওষুধ পথ্য খাওয়াবেন, সমস্ত দরজা জানালা সবসময় খুলে রাখবেন, ছেলে আপনার ভাল হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই।

"আমরা অনেক স্থলেই ব্যর্থ হয়ে যাই শুধু শুশ্রূষার দোষে, আত্মীয়দের বা রোগীর ধারণা—বড় বড় ডাক্তার দেখান, ফলাও করে চিকিৎসা—এতেই শুধু রোগ আরোগ্য হয়, নজর রাখেন শুধু সেই সব দিকেই, শুশ্রূষার কথাটাতে তাঁরা কানই দেননা—বাধা নিষেধ-গুলো মনে রাখারও দরকার বোধ করেন না। আপনি অবশ্য নিজে থেকে কথা দিচ্ছেন—কিন্তু ঠিকই পারবেন ত যা যা আমি বলে যাব তেমনি চলতে ?"

সাগ্রহে—উত্তর ক'রে সরযূ "পারব ! পারব আমি ! যা বলবেন তা ঠিকই পালন করবো। আমি জানি—টি, বি,তে শুশ্রূষাও চিকিৎসার একটা বড় অংশ। আপনার বাক্য আমি বেদ বাক্যের মতই মেনে চলব, আপনি ওর চিকিৎসা আরম্ভ করুন।"

"বেশ—" উদ্ভাসিত মুখে উত্তর করেন ডাক্তার বাবু "এখুনি ওকে ফটো করতে নিয়ে যাবনা। ষ্ট্রেপটোমাইসীন—কোর্স শেষ করি,—দেখুন টি, বি, শুনেই লোকে কেমন আঁতকে ওঠে, কিন্তু সত্যই তা নয়, চিকিৎসকের উপদেশ মেনে চললে—টি, বি, সম্পূর্ণ সারে, আর—ধনে প্রাণে কথাটাও সত্য নয়—ডাক্তারের নির্দ্দেশে চললে—পুনরাক্রমণ হয় না—এক কোর্স ষ্ট্রেপটোমাইসীন নিলেই সেরে যায়—অসম্ভব—খরচ হয়না।

আচ্ছা যান আপনি—ছেলে আপনার অনেকক্ষণ একা আছে—ওষুধ পত্র আনিয়ে আমি পরে যাচ্ছি!"

(৮)

সাধনা আরম্ভ হইয়া যায় সরযূর। সিদ্ধিও দেখা দেয় মূর্ত্তিমন্ত হইয়া, দিনে দিনে সুব্রত আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়। শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার ও আপন হাতে ভাত খাইবার অনুমতি পাইয়া যায় দুমাসের মধ্যে। পরম কৃতিত্বের সহিত তাকাইয়া দেখে সরযূ মৃত্যুর মুখ হইতে ছিনাইয়া আনা সুব্রতর মুখের প্রতি। পাণ্ডুর গণ্ডে তাহার রক্তিমাভা, হতাশা কাতর চোখে মুখে আশার উজ্জ্বলতা! বাঁচিবে, সরযূর সুব্রত বাঁচিবে! আরও কয়েকটা মাস পরে সাধনার সমাপ্তি হইবে তাহার!

কি মূল্যে সুব্রতর জীবন পাইল সরযূ—তাহার হিসাব একবারও খতায় না। সে পরে!—আগে সুব্রতর সুস্থতা, আপনার জীবনের হিসাব নিকাশের খাতা তখন খুলিবে।

প্রাণকৃষ্ণকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছে। দূর হইতে বিচার কাহারও করা যায়না—করা উচিৎও নয়, মদ খায় লোকটা, তা থাক্! কাহারও কোন অনিষ্ট করেনা—কটু কথা কাকেও বলে না, বরং মদ খায় বলিয়াই বোধ হয় মুক্তহস্তে ধন বিলাইতে পারে 'ভগবান একজনকে ঢালিয়া দেন পাঁচজনের দুঃখ দূর করার জন্যে' একথা সুস্থ মস্তিষ্কে কেহ বলিতে পারেনা—প্রাণকৃষ্ণ মাতাল বলিয়াই বুঝি পারে। সরযূ সুব্রতকে যথেষ্ট সমীহ

করিয়া চলে প্রাণকৃষ্ণ, হৈ-হল্লা যা করে তা একতলাকে অতিক্রম করিয়া তিনতলায় কিছুমাত্রও প্রবেশ করে না।

হয়ত দুদিন অন্তর ক্ষণেকের তরে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছে "কেমন আছে সুব্রত, কোনও অসুবিধা নাইত? যখন যা দরকার সরকার মশায়কে ব'লো, ওঁর কাছেই টাকাকড়ি"—

সামান্য দুটি হুঁ, হ্যাঁ দিয়া সরযূ উত্তর শেষ করিয়াছে। প্রথম প্রথম সুব্রত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "ও লোকটা ত ভালনা ওঁর এখানে এলে কেন?" সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়াছে সে—"বড় দায়ে পড়েছিলাম—গরীব, অনাথা আমি—সাহায্য চেয়েছি আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি ভাল কি মন্দ তার বিচার করবার দরকার কি বাবা?"—

বিচার করিতে চাহেও নাই সুব্রত! জননীর উপদেশে, ডাক্তারের নির্দেশে 'কায়েন মনসা বাচা' চেষ্টা তাহার সুস্থ হইবার! আমি ভাল হইব, সারিয়া যাইতেছে অসুখ, দিন দিন সুস্থতা বোধ করিতেছি—এই চিন্তায় সে বিভোর থাকে সদাই।

হাল্কা রূপকথা বলিয়া ঘুম পাড়ায় তাহাকে সরযূ, ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্তব পাঠ করিয়া শুনায় সুমধুর স্বরে, দুপুরে শুনায় রামকৃষ্ণ কথামৃত, বিকালে গীতাঞ্জলির ভক্তি সরস গান কবিতা, আরোগ্যের বাণী, আশার বাণী—শুনিতে শুনিতে, ভাবিতে ভাবিতে, সুস্থ অলস ঘুমে কাটিয়া যায় সুব্রতর রোগশয্যার দিনগুলি। তাহার মঙ্গল চিন্তায় কাটিয়া যায় সরযূর সকল মুহূর্ত্ত। আপনার চিন্তা, বা তাহাদের ছাতের উপরকার ছোট্ট ঘরের বাহিরে কি

ঘটিতেছে, সরযূকে লইয়া কোন কলরোল উঠিয়াছে কিনা কিছুই ভাবিবার অবসর সরযূর হয়না। সাধনা সিদ্ধির পথে নিরুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া যায়। সাধনা করিতে পারিলে বুঝি এমনিই সিদ্ধি সকলের ভাগ্যে আসিয়া থাকে।

(৯)

ঐকান্তিক সাধনা কখনও ব্যর্থ হইতে দেখা যায় নাই—সরযূও ব্যর্থ হয়না, ডাক্তারবাবু সত্যই একদিন বলিয়া যান "ছেলে আপনার ভাল হ'য়ে গেছে, তবে এখনও দুটি মাস চুপ চাপ বেড়াবে, খাবে কাজ কর্ম্ম খুব করতে পাবেনা, কলকাতার এত শীতের সময়কার হাওয়াটা খারাপ, পারেন ত পুরী টুরী কোথাও চেঞ্জে অর্থাৎ বেড়াতেই পাঠান, দেখলেত বাবা! টি, বি, কেমন সারে? মনে বিশ্বাস রেখে—চিকিৎসকের উপদেশ নির্দ্দেশ পালন করে চলতে পারলে টি, বি, সেরে যাওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এখন মাস কতক শুধু একটু সমঝে চলবে—এবং তার পরে চাকরী বাকরীও করতে পার তবে—পাঁচ বছর খানেক—মনে রাখতে হবে—যে তুমি এই রোগের কবলে পড়েছিলে—

"দৌড় ঝাঁপ করা—বেশী ভারী তোলা—বল খেলা, এই সব গুলো করতে পাবেনা—ব্যাস্—আর কিছুনা আমার হাত থেকে তুমি এখন মুক্ত।"

ডাক্তার বাবুরই নির্দ্দেশিত এক স্বাস্থ্য নিবাসে পুরীতে পাঠাইয়া দেয় সরযূ সুব্রতকে।

নিদারুণ পরিশ্রম, উত্তেজনা অন্তে তাহার পর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে সে! জীবনের খাতা খুলিয়া হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া দেখিতে পায় না কোথাও আলো,—গভীর অন্ধকারে তাহার সম্মুখের সমস্তটা ঢাকা। কি কৈফিয়ৎ দিবে সে অনাত্মীয়, দুশ্চরিত্র মদ্যপ প্রাণকৃষ্ণের গৃহে বাস করিবার? পাগল হইয়া উঠে সরযূ কোথা যাইবে,—প্রাণকৃষ্ণের গৃহ হইতে কোথায় পালাইবে, সুব্রতকে বাঁচাইবার জন্য এক মাত্র পথ—পরমার্থ বোধে—পাইয়াছিল সে প্রাণকৃষ্ণের আশ্রয়! কিন্তু এখন সে কি করিবে? শুধু সুব্রতর জীবন চাহিয়াছিল সরযূ, তাহার পর যে প্রশ্ন কিছু উঠিতে পারে তাহা সে চিন্তাও করে নাই। কিন্তু সম্মান হারাইয়াই বা সুব্রত থাকিবে কেমন করিয়া? ফিরিয়া সে দাঁড়াইবে কোথায়? প্রাণকৃষ্ণের আশ্রয় সে কেমন করিয়া লইবে কিছু ঠিক করিতে পারেনা সরযূ—ভাবিয়া আকুল হয় শুধু।

কোনও দিশা পায়না, আকুল চিত্তে ঈশ্বরকে ডাকে যিনি অদম্য সাহস দিয়াছিলেন—সুব্রতকে বাঁচাইবার প্রচেষ্টায়, যিনি বাঁচাইয়াছেন সুব্রতকে—আকুল হইয়া ডাকে সরযূ বিপদ ভঞ্জন, সেই শ্রীমধুসূদনকে। প্রাণকৃষ্ণকে আর দেবতা মনে হয়না, কেমন যেন গা ছমছম্ করিয়া উঠে তাহাকে দেখিলে।

সুব্রতর কল্যাণ কামনা করিতেও ভুলিয়া যায় সরযূ—, কি ভাবিতে গিয়া কি ভাবিয়া বসে—কখনও আপনার মনে কাঁদিয়া ভাসায়,—আবার কখনও হাসিয়া উঠে আপনার অদৃষ্ট

ভাবিয়া—ক্ষোভে, দুঃখে। সুব্রত পত্র দেয় নাই অনেক দিন, পত্রের মধ্যেকার মাধুর্য্যও কেমন যেন ছাড়া ছাড়া! হঠাৎ একদিন মনে হয় সরযূর তাই ত। সুব্রতর পত্রগুলি ক্ষীণ হইতে হইতে কবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে অনেক দিন—কেমন আছে ব্রতু, বাছা ভাল আছে ত, চার মাস হইয়া গিয়াছে দেখে নাই তাহাকে সরযূ. হৃদ যন্ত্র যেন কেমন বন্ধ হইয়া আসে—চার মাস—চারমাস দেখে নাই,—সুব্রত একমাস পত্র দেয় নাই, তবে! তবে কি—না না সুব্রত ভুলিবে মাকে? প্রশান্ত হাসি ফুটিয়া উঠে সরযূর মুখে! সুস্থ হইতেছে দিন দিন—মনের আনন্দে বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে সময় হয়না কি আর রোজ রোজ পত্র লিখিবে মাকে।

হঠাৎ অকুলে কূল দেখিতে পায় সরযূ, ঐখানে, ঐ-পুরীতে যাইলেই ত হয়—মাতা পুত্রে ক্ষুদ্র নীড় বাঁধিয়া বাস করবে সুদূর উড়িষ্যায়। জীবিকা খুঁজিয়া লইবে সুব্রত ঐখানে।

সব গ্লানি মুছিয়া দিবেন সরযূর দারু ব্রহ্ম পতিত পাবন জগন্নাথ? সেই ভাল ভাবিতে আর পারেনা অদম্য শক্তি আসিয়া যায়—হঠাৎ যেমন করিয়া আসিয়াছিল প্রাণকৃষ্ণের বাড়ী—এক বস্ত্রে শূন্য হস্তে—তেমনি বাহির হয় সরযূ, ভাবিতে সময় হয়না—কোথায় কতদূরে শ্রীক্ষেত্র, কোথায় সুব্রত কেমন করিয়া যাইবে সেখানে।

(১০)

ছুটিয়া চলে সরযূ। ব্রতু! ব্রতু! তাহার ব্রতুকে পাইবে আজ বুকের সন্নিকটে—সব গ্লানি, সকল কালিমা মুছিয়া যাইবে তাহার সুব্রতর চাঁদ মুখ দেখিয়া। আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বলিতে বলিতে পথ চলে সরযূ—ব্রতু, আমার মানিক, আমার সোনা,—

ধাক্কা খাইয়া ভ্যাবাচ্যাকা পথিক দু-এক জন বলিতে থাকে 'পাগল হউচি পা,' কিছু বলেনা মনে মনে হাসে সরযূ ক্ষিপ্রতর গতিতে অগ্রসর হয় চক্রতীর্থ সাগরের তীর উষাবাস স্বাস্থ্য নিবাস—কই, কই, কোথায়? কতদূরে?

কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়া নিমাই কি ছুটিয়া ছিলেন—এমনিই করিয়া? পূর্ণ চন্দ্রকে ধরিবার জন্য সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এমনি বিভোল মনোবেশে? হাসে সরযূ আপনার মনে! কৃষ্ণ প্রেম! সন্তান প্রেম আরও অনেক বেশী, অনেক মধুর, অনেক আন্তরিক, অনেক—অনেক—অনেক—

ওকি! সুবেশা তরুণীর হাত ধরিয়া অপূর্ব্ব উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে ঢল-ঢল কান্তি কে ও!

আনন্দে জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়, সরযূর চোখের উপর শুধু ফুটিয়া থাকে সুব্রতর সুন্দর মুর্ত্তি।

রহিত হইয়া যায় সরযূর সমস্ত ইন্দ্রিয়—ডাকিতে পারেনা চলিতে পারেনা, শুধু বিস্ফারিত নয়নে দেখে চলমান, ক্রমে

ক্রমে অপস্রিয়মান সুব্রতকে সরযূর হৃদয় নিংড়ান দুঃখের—সিদ্ধির প্রতীক, সুস্থ, সুন্দর সুব্রতকে। কিন্তু! কে ও তরুণী? কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঢলিয়া পড়িতেছে সুব্রতর দেহের উপর! কই উহার কথাত সুব্রত লেখে নাই।

ধীরে ধীরে চৈতন্য আসে, আপনার দীন বেশের দিকে চাহিয়া সুব্রতকে ডাকিতে, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে লজ্জা হয় কেমন। অনাহারে, অনিদ্রায় বিনা মাশুলের অপমান মাথায় বহিয়া দুইদিনের পথ শ্রান্ত দেহের প্রতি তাকাইয়া সরযূ আর অগ্রসর হইতে পারেনা। অধীর হৃদয় শাসন করিয়া রাখে—বাছা লজ্জা পাইবে বড় লোক বান্ধবীর সম্মুখে—তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে। ছুটিয়া বুকে জড়াইয়া ধরা সরযূর পক্ষে সঙ্গত হইবেনা। আগাইয়া চলিয়া যায় তাহারা হাসি গল্পে সাগরের রুদ্র গর্জ্জনকেও ছাপাইয়া! এক দৃষ্টে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাকাইয়া রহে সরযূ। ধীরে ধীরে আপনার অজ্ঞাতসারেই এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হয় সম্মুখের পথে, যে পথে সুব্রত অদৃশ্য হইয়াছে সেই পথে! ভয়াল, গম্ভীর, সৌন্দর্য্যের আকর মহাম্বুরাশীর প্রতি ফিরিয়াও চাহেনা, বুঝি কর্ণেও সে মহাগর্জ্জন শুনিতে পায় না। অজ্ঞাতসারেই কখন দাঁড়াইয়া পড়ে উষাবাস স্বাস্থ্য নিবাসের সম্মুখে।

ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে শুধু। অনেকক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন "এই বুড়ী—কাকে চাই?"

চমকিয়া উঠে সরযূ! বুড়ী যুবাব অধিক মনোবলে দেহবলে সংসার যুদ্ধে একাকিনী লড়িয়াছে সে, বুড়া হইল কবে?

আপনার হাত তুলিয়া দেখে—এলো মেলো চুল হাতে কবিয়া নিরিখ কবে পাকিয়াছে কি? চর্ম্ম কি লোল হইয়াছে? আপনার মনে শেষে বলিয়া উঠে "হবেও বা! হয়ত বুড়ো হ'য়ে গেছি। হ্যাঁ! কাকে চাই, সুব্রত বলে একটা ছেলে থাকে—তাকেই দরকার কই? কোথায় সে?"

"ওঃ,। সুব্রত বাবু! তা তাকে এখানে কোথায় পাবে" ছিলেন বটে, এখনত মাস খানেক নেই ওই যে দেখছ ওই লাল বাড়ীটা? ওই খানে গেলেই দেখা পাবে—প্রেমে পড়ে গেছে ভদ্রলোক—" স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সবযূ—

প্রেমে পড়েছে! সুব্রত! উচ্ছসিত সেই কলকণ্ঠ, সুবেশা তরুণী। লাল বাড়ী,--তবে—কি তবে কি--কিন্তু কেন সুব্রত মাকে জানায় নাই?

মাকে না জানাইয়া ত সে একটি আধলাও কাহাকে কোনও দিন দান কবে নাই! হৃদয় দান করিবে মাকে না জানাইয়া? কাহার হৃদয়? সে ত সরযূব, সুব্রত ত সরযূব! আর শিশু সে হৃদয় দানের কিই বা জানে?

বিবেক হাসিয়া উঠে—বাইশ বছবেব ছেলে হৃদয় দান জানিবেনা? শিশু। আব হৃদয় দান করিতে আবার অনুমতিব সময় থাকে? না কেউ অনুমতি লইয়া হৃদয় দান করিয়া থাকে?

তাইত ! সংশয়াকুল চিত্তে মন্থর গমনে অগ্রসর হয় সরযূ লাল বাড়ীটারই প্রতি। অতি ধীরে ধীরে কখন এক সময় গেটের কাছে পৌঁছিয়াও যায়। বালি ভরা আঙ্গিনায় বেতের ডেক চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে সেই বিলোল কটাক্ষী তরুণী, পাশে সুব্রত আর এক দিকে একজন যুবক। তাহাদের সুসজ্জিত পরিবেশের সম্মুখে আপনার দীন বেশ বড় বেশী ফুটিয়া উঠে। ইতস্ততঃ করে সরযূ। রূঢ় কণ্ঠের প্রশ্ন বাজে কানে "কাকে চাই, কি দেখছ এখানে হাঁ করে ? কে তুমি ?"

তরুণী, সুন্দরী নিশ্চয় সুশিক্ষিতা—এত রূঢ় তাহার কণ্ঠ ! অবাক হইয়া চাহিয়া রহে সরযূ—হঠাৎ কিছু উত্তর জোগায় না মুখে—

"চেন নাকি সুব্রত ওকে ? তোমার দিকেই তাকাচ্ছে ত" ? উঠিয়া পড়ে সুব্রত—"হ্যাঁ—না ঠিক চেনা নেই—তবে দেখেছি দেশের লোকও। কি দরকার তোমার ? শোনো—এই দিকে" গেটের বাহির দিকে পা বাড়ায় সে।

স্তম্ভিত সরযূর চরণ যেন আটকাইয়া যায়, চলিতে পারেনা। ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভরে ইঙ্গিতে করে তরুণী "যাওনা ! ওইত বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার দেশের লোক দেখছ কি হাঁ করে ?"

"হাউ ফুল—" পার্শ্বোপবিষ্ট যুবকটি এক রাশি হাসিয়া উত্তর করে সে কথার—"তোমাকে দেখছে। আমরা ত আমরা, তোমাকে দেখলে মেয়েদেরও মাথা ঘুরে যায়—"

রূঢ় সত্যের ধাক্কা খাইয়া অবচেতন অবস্থা কাটিয়া যায় সরযূর, অনুসরণ করে সুব্রতর।

"কেন তুমি এসেছ এখান পর্যন্ত? কেন আমাকে অপদস্থ করছ এমন করে?"

সুব্রতর কণ্ঠ কি? শুনিতে পায় কি সরযূ সুব্রতর তিরস্কার? ভারি সুন্দর হইয়াছে সুব্রতর শরীর পূর্ব্বের সেই লিকলিকে পাতলা পাণ্ডুর চেহারা আর নাই, গোলাপফুলের আভা বাহির হইতেছে—তাহার গণ্ড দিয়া বিস্ফারিত নয়নে তাকায় সরযূ। দীনমূর্ত্তি দেখিলে করুণা জাগিত মনে সে সুব্রত নাই আর! পরম রূপবান, পরম কান্তিবান যুবক, সুরভিত সুসজ্জিত কেশ-বাস কে এ? একি সরযূর সুব্রত? সরযূর প্রাণাধিক পুত্র? পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়াছে কি ইহাকেই বুকে জড়াইয়া ধরিবে বলিয়া, কপালে, কপোলে প্রীতি চুম্বন দিয়া নয়ন জলে অভিষেক করিয়া লইবে বলিয়া? কে এ? কোথায় সরযূর সুব্রত! "কি দেখছ তুমি? কেন এসেছ? তোমার কলঙ্কের বোঝা আমার মাথায় তুলে না দিলে কি তোমার শান্তি হচ্ছেনা যে?"

কি বলিতেছে ও? ওকি সুব্রত? ওকি তবে পাগল হইয়া গিয়াছে? বিস্ময়ে স্তব্ধ সরযূর মুখে বাক্য সরেনা কিই বা ওকে বলিবে, ও ত প্রলাপ বকিতেছে!

আবার সুব্রতর কণ্ঠ বাজিয়া উঠে—"দেখ মা! মা বলতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে ঘৃণায়! আমি তোমায় মিনতি করছি

তুমি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখনা, আমি এবারকার টাকা ফেরৎ দিয়েছি—টাকার আর দরকার নেই, চাকরী পেয়েছি আমি এখানেই। ওই মেয়েটিকে বিয়ে করে এখানেই বাস করব। তুমি আমার জীবন পথে আর এস না! তোমার পরিচয়ে হয়ত আমার সমস্ত সুখের আশায় ছাই পড়ে যাবে। যে পথে খুসি তুমি চলগে, শুধু আমার পথ ছেড়ে দাও, আমার নাম ভুলে যাও"—

"ভুলে যাব! ব্রতু, ব্রতু! ব্রতু আমার রে—তোর নাম ভুলে যাব?" হো হো করিয়া উন্মাদের মত হাসিয়া উঠে সরযূ —"পাগল হ'য়ে গেছিস তুই? তোর আমি বিয়ে দেব—আমার বৌমা হবে তার খোকা খুকু হবে আমার নিজস্ব সংসার হবে, আমি স্বাধীন হ'য়ে তোদের নিয়ে থাকব এযে আমার কত আশা —এতদিনে—এইবার সে আশাতো সফল হবার দিন এসেছে কত আনন্দ! এ আনন্দ কি চাপা যায়?

জীবনের সব দুঃখ যে এবার অবসান হবার দিন এসেছে! ওকি! "কোথা যাস—ব্রতু ব্রতু—ব্রতু"—

তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া সুব্রতর দিকে ছুটিতে যায় সরযূ, ক্ষীণ উপবাস ক্লিষ্ট দেহ উত্তেজনা সহিতে পারেনা—পড়িয়া যায়, আবার ওঠে—আবার ছোটে আবার পড়ে!

কিন্তু কোথায় সুব্রত! পথের শেষে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় সরযূ —উত্তাল তরঙ্গ মালা—বক্ষে ধারণ করিয়া চিরজাগ্রত বারিধি সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়—কোথায় পথ কোথায় সুব্রত!

সুব্রতকে অনুসরণ করিবে কোন পথে? বারিধি আহ্বান জানায়—আয়! আয়! আয়! নদীর মত ছুটিয়া আয় আপনাকে বিলাইবি কে শান্তি পারাবারে! তাপিত চিত শীতল করিবি কে? আয়! আয়! আয়!

পাগলিনী হাসিয়া উঠে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দেখে বুঝি সুব্রতরই প্রতিকৃতি—

"ওরে যাসনে—যাসনে—দাঁড়া আমিও যাই" নির্জ্জন সমুদ্র তীর! কেহ দেখেনা—সরযূর জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্যের কেহ সাক্ষী থাকেনা—, ব্যথিতের বেদনা বহিয়া শুধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে সাগর—বাতাসে কান পাতিলে শুধু শোনা যায় চাপা ক্রন্দনের গুমরানী। নাইবা পড়া গেল বারিধির ভাষা, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ফুলিয়া উঠে তাহার বিদ্রোহ, মানব জাতির প্রতি হিংস্র সহস্র ফণায় মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে জানায় বিদ্বেষ!

পারমিতা

সরকারী শস্য ভাণ্ডারের সর্ব্বময় কর্ত্তা অনুপম—জেলার ধান চাউল বাহিরে যাহাতে না যাইতে পারে অতিরিক্ত সঞ্চয় যাহাতে না করে কেউ—এই সব দিকে দৃষ্টি রাখাই সরকারী কার্য্য, এবং উদ্‌বৃত্ত ধান্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অভাবগ্রস্থ জেলায় প্রেরণ করাও আর একটি প্রধান কার্য্য।

রেশন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রূপ সরকারী সংগ্রহকারী কর্ম্মচারী ও গুদাম প্রত্যেক জেলায় জেলায়ই—প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

অনুপমের চাকরীটা বেশ লাভ জনক, 'পান' খাইতে বেশ দু পয়সা পাওয়া যায়, অর্থাৎ সঞ্চয় কারীর গোলার মধ্যে কার ধানের কমবেশী ভাল মন্দ নির্ভর করে অনুপমের 'পান' খাইবার কম বেশীর উপর। যে যেমন দিবে—তাহার স্বার্থ ও অনুপম তেমনি দেখিবে। একেবাঁরে নগদ কারবার! চলিতেছিল অনুপমের মন্দ নহে—কিন্তু দেশের লোকগুলাই পাজী, এক টাকা—, পাঁচ সিকার রোজে পেট ভরিবেনা প্রত্যেকে ধরিবে হৈই বাবু এক আঁজল ধান দাও ক্যাণে" পেট ভরেনা বাবু পাঁচ সিকা পয়সায় দেবাবু—" আরে! ধান কি অনুপমের বাবার ক্ষেতের?

স্ত্রীকে আনিয়াছে সে! ছোট খাট হইলেও সংসার ত এক্‌টা চালাইতে হয়—, উপরী ধান তো তাহার—লাগিবেই কিছু!

বেশ—দুই চারি খানা গহনাও দিয়াছে অনুপম—পারমিতাকে! চওড়া আর্ম্মলেটের তলায় ঘামাচি চিড় বিড় করিলেও খুলিতে মমতা আসে পারমিতার, কাঠির মত হাতে বেশ মাংস লাগিয়াছে—ছেলা বরফি প্যাটানের আর্ম্মলেট কাটিয়া বসিয়াছে সেই হাতে, ঝিক মিক করিয়া যখন সোনার জ্যোতি ছড়ায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে—সে। গলার ভারি পাশা হারটারও ওই এক সমস্যা,—গরম লাগে—ঘামাচি হয় তবুও—কি সুন্দর মিষ্টি পরশ—চুড়ীগুলার কি মধব বাজনা—!

অনুপমেরও সে চিচিঙ্গে মত লম্বা কুঁজো চেহারা একদম বদলাইয়া গিয়াছে—বেশ নেওয়াপাতি ভুঁড়ি আর তেল চুকচুকে—চামড়া হইয়াছে—হঠাৎ দেখিলে পুরাণ বন্ধুরা চিনিতেই পারিবে না।

সদাশয় গভর্ণমেণ্টের বণ্টন ব্যবস্থার কল্যাণে বেশ কাটিতে-ছিল—অনুপমের—, মামা শশুর বাড়ীর হাঁড়ী ঠেলার হাত হইতে পারমিতাও নিস্কৃতি পাইয়া ছিল, কিন্তু! সম্প্রতি বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে বুভুক্ষ গ্রামবাসীর দল।

বড় লোক—অর্থাৎ চাষী গৃহস্থের নিকট হইতে ধান ধার লইয়া—অথবা কিনিয়া—এক সম্প্রদায়ের দিন চলে—, গ্রামের শত করা শতজন ত চাষা নহে! মজুরই বেশী—তাহারা মজুরী লব্ধ অর্থে ধান কিনিয়া খায়—জেলে, মালো—, মুচী—বেশীর

দুস্থ লোকেরই—চাষের জমী নাই। সরকারের ত তাহা দেখিবার দায়িত্ব নাই—যাহার নাই—তাহার আর কে কি দেখিবে, যাহার আছে—তাহারি নিকট হইতে সরকার কাড়িয়া—অর্থাৎ—কণ্ট্রোল দরে কিনিয়া—লইয়া অন্যত্র চালান দিবেন !

হতভাগ্য, বুভুক্ষ গ্রামবাসীর দল অহরহ প্রদক্ষিণ করিয়া ফেরে ধানের গুদাম—গুদাম বাবুর বাসা ! মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারেনা—ভিক্ষুক নহে তাহারা—কিন্তু ক্ষুধা স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টি তাহাদের অনুপম যেন সহিতে পারেনা, অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়—সাবধানে গুদামে চাবী লাগায়—স্বযত্নে আপনার মাথার বালিসের নিচে রাখে—একজন নেপালী বন্দুকধারী রক্ষী থাকিতেও সদরে লিখিয়া আনাইয়া লইয়াছে আরও একজন রক্ষী দুর গ্রামে ধান মাপিতে যাইবার সময় চাই সঙ্গে একজন—আবার গুদাম পাহারা দিতেও চাই একজন, সঙ্গীন উচাইয়া সব সময় তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় মানুষ ত মানুষ—পায়রা পর্য্যন্ত শস্য কণা খুঁটিয়া খাইতে ভয় পায়—

তবুও—অনুপমের স্বস্তি নাই—কি যেন এক অজ্ঞাত অশঙ্কায় বুকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া উঠে মাঝে মাঝে।

আর এক জ্বালা। 'গোদের উপর বিষফোড়া'র মত পিছনে লাগিয়াছে পারমিতা—

"এ রকম দুর্ভিক্ষ সহ্য করা যায় না, চলনা গো দুদিন আমরা কলকাতা ঘুরে আসি ?"

মতিচ্ছন্ন, নহে তাহার ? ঘুরে আসি, ঘুরে আসি বলিলেই

হয়, এত বড় দায়িত্ব, তাহার উপর দুর্ভিক্ষের মরসুমে—মজুদ-দারদের ধরিতে পারিলে মোটা পাওনা হইবে অনুপমের, চল বলিলেই যাইবে ওমনি !

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! দেশের লোকগুলা হইল কি ? দাঁড়াইতে পারেনা, টলিয়া পড়ে একটি বস্তা তুলিতে, ইহারই বা কি উপায় করা যায় ? মজুর অভাবেই ত সব কাজ পণ্ড হইতে বসিয়াছে !

(২)

পরমিতা কেমন যেন হইয়া যায় ! অসহ্য হয় তাহার চওড়া আর্ম্মলেট, হাঁপ ধরে গলার হারে, কিন্তু খুলিয়া ফেলিয়াও সস্তি পায়না, আকুপাঁকু করিয়া মরে, একী সর্ব্বনাশ করিতেছে অনুপম ! কোথাও আর ধান নাই অথচ গুদাম ফাটিয়া পড়িতেছে ধানে, জীবন্ত নর কঙ্কালের দল ছায়া মূর্ত্তির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অনুপমের বাসা—প্রদক্ষিণ করিতেছে গুদাম। মেয়ে মানুষ হইয়া—মায়ের জাত হইয়া—কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবে পারমিতা ? ভাত মুখে তুলিলে আটকাইয়া যায় তাহা গলায়, কিন্তু দিয়াও দেখিয়াছে সামান্য কয়েকটি ভাত লইয়া কি কাড়াকাড়ি গালাগালির উৎপত্তি।

অনুপমকে আবার অনুরোধ জানায় "ওগো—এদৃশ্য আর সইতে পারিনা চল পালাই, এমন করে আমি আর বাঁচব না —"

"তা বাঁচ কেন," ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠে অনুপমের মুখে—"হা

ঘরে হা ভাতে ছিলেত ! তা আর ভুলতে পারছনা আমিও এখন হা ভাত ; হাভাত করে ঘুরে বেড়াই তাহ'লে খুব খুসী হও। কতকগুলো মূর্খ নর পশু, তাদের জন্য আবার দরদ !"

মূর্খই বটে ! গ্রাম ভর্ত্তি বুভুক্ষ, মাত্র—দুটি সেপাই এর ভয়ে শুখাইয়া মরিতেছে, প্রতিবাদ জানাইতেছে না—খাইতে লইয়া যাইতেছে না—গুদাম ভরা রাশি রাশি ধান।

হায় রে ! মূর্খের দল—এমনি করিয়াই মরিবি তোরা, তবু অধিকার দাবী করিবিনা। পারমিতার মন বিষাইয়া উঠে স্বামীর উপর—সম্পদের নেশায় একী অন্যায়—ধর্ম্মে কেমন করিয়া সহিবে ইহা ?

কিন্তু করিবেই বা কি পারমিতা ?

অনুপমকেই সাধাসাধি করে পুনবায়—"আর যেওনা গো ধান আনতে, যার যা আছে ধার দিলে বিক্রি করলে এখন কিছু লোক বাঁচতে পারে' চোখ রাঙ্গাইয়া উত্তর করে অনুপম—"দেখ যার যাতে অধিকার তাতেই তাকে মানায়, অনধিকার চর্চ্চা করতে এসোনা। বলে দেব বাহাদুরকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবে ওই হাঘরের দলকে—তোমার ত্রিসীমানায় যাতে না আসতে পারে—মনে ভেবেছে কাঁদুনী গাইলেই বুঝি গুদোমের চাবটাই খুলে দেব—"

দূর গ্রামে যাওয়ার জন্য সাজ পোষাক পরিতে থাকে অনুপম—পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়ে পারমিতা—"তোমায় আমি যেতে দেব না আর ধান আনতে দেব না—"

"যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!" এক লাথিতে পারমিতাকে সরাইয়া দেয় অনুপম—রওনা হইয়া যায় দূর গ্রামে—রাত্রি হইবে—লণ্ঠন লইতে বলে রক্ষীকে, উপদেশ দিয়া যায় রক্ষী মন বাহাদুরকে—"লেটোমৎ চারি তরফমে আঁখ রাখিয়ে।"

ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসে পারমিতা—

ভাবিতে থাকে কি সে করিবে—নারী বলিয়া শুধুই হাহুতাশ করা ছাড়া আর কোন কাজে অধিকার নাই তাহার? তুচ্ছ জীবনের বিনিময়েও কি কিছু পারে না করিতে? হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়—অনুপমেরই কথা, গুদামের চাবিটাই খুলিয়া দিবে কি? হাতছানি দিয়া ডাকে—একজন জীবন্ত নর-কঙ্কালকে—বলিয়া দেয় "শীগগীর পাড়ায় যা, সবাইকে বলবি আমি গুদোম খুলে দেব, গুদোমবাবু দূর গাঁয়ে গেছে অনেক রাতে ফিরবে, তোরা যে যত পারিস ধান নিয়ে যাবি, বস্তা নিয়ে আসিস আমি দেব, শীগগীর যা সব্বাইকে বলে আয়—"

থর থর করিয়া কাঁপে—উত্তেজনায় পাগল হইয়া উঠে পারমিতা। পারিবে—অন্ততঃ একটি কাজও পারিবে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—করিবে না হয় মরিবে—চাবিটাকে শক্ত হাতে ধরিয়া গুদামের দরজায় যায়!

"মাইজী" সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়ায় মন বাহাদুর। মিষ্ট কণ্ঠে আদেশ করে তাহাকে পারমিতা—"কেওয়াড়ী খোল দেওত সিপাইজী মেরা থোড়া কাম হ্যায়—"

"হ্যাঁ আচ্ছা—ঠিক হ্যায়, ও পিছুকা কেওয়াড়ি খুলত হ্যাঁ ও

দোনো দরজা খুলনে পড়ে গা। আচ্ছা বন্দুকঠো দেওত হামারা হাতমে।” সরল মনেই বন্দুকটা পারমিতার হাতে দেয় মন বাহাদুর কিন্তু তার পরই বলিয়া উঠে “লেকিন কেওয়াড়ী কাহে খুলেগা মাইজী, ও দেখো ও সব লোক ত আতেই রহি—”

“আহা! হাতমে হাতিয়ার হ্যায় ডর কেয়া?” কিন্তু হাতিয়ার আর দেয় না পারমিতা উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে “কই তোমরা এসো, নিয়ে যাও যে যত পার ধান নিয়ে যাও—ও তোমাদেরি জিনিষ, ভয় নেই, এই দেখ বন্দুক আমার হাতে—।” মুমূর্ষ, বুভুক্ষেরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়—সাহস নাই শক্তি নাই—উপবাস ক্লিষ্ট চরণে ক্ষমতাও নাই বুঝি!

গ্রামোফোনের দম দেওয়ার মত বলিয়াই চলে পারমিতার কণ্ঠ—“নিয়ে যাও যার যতটা শক্তি নিয়ে যাও, এ তোমাদের জিনিষ—তোমাদেরই বুকের রক্ত জল করা ধান এ, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।” বৃথাই মিনতি করে মন বাহাদুর “এ মায়িজী এ তোম কেয়া কর রহা? হাতিয়ার হামকো দে দেও ও লোক সব লুট লেতা—এ মায়ি—”

তীব্র দৃষ্টি একবার ফিরিয়ে নেয় পারমিতা—“ভুখ ক্যায়সা চীজ জানতা নেই তোম? ও লোক ভুখসে লুঠ লেতা ভুখ উস্‌কো হুকুম দিয়া।”

তবুও বলে মন বাদাতুর ‘এ মায়িজী তোমকো নসীবমে বহুত দুঃখ হ্যায়, এইসা কাম তোম কাহে করতা মায়ী—আভি দে দেও হামকো হাতিয়ার—”

রাত্রি হইয়া আসে—গাড়ীতে ধান বোঝাই করিয়া ফিরে অনুপম—একি ! কি সর্বনাশ—! চার দরজা খোলা গুদামের ? দৌড়িয়া ঢোকে, বজ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে "একি হ'চ্ছে মিতা ? কোন সাহসে করলে এ কাজ ?" হাতের বন্দুক উঁচু করে ফায়ার করে লুণ্ঠনরত নরকঙ্কাল দলের উপর। শরাহত পক্ষীর মত লুটাইয়া পড়িয়া ছট্ ফট্ করে জনা দুই—পলকের মধ্যে ঘটিয়া যায়—এ ঘটনা। পারমিতা আগাইয়া আসে—

"খবরদার—আর একবারও ফায়ার করেছ কি তোমার জীবন সঙ্গে সঙ্গে গেছে মনে করবে। আমার হাতেও বন্দুক—"

ব্যঙ্গের হাসি হাসে অনুপম তাহার হাতের বন্দুক আর্তনাদে গর্জন করিয়া উঠে—

অনুপমের বক্ষস্থল লক্ষ্যে সেই সঙ্গেই গর্জন করে পারমিতার হাতেরও বন্দুক।

* * * *

তাহার পর ! যবনিকা উঠে আদালতে ! পতিঘাতিনীর বিচার দেখিতে সেদিন সমবেত হয় অনেক দর্শক ! সেই জনতার দিকে তাকাইয়া আসামীর কাঠগড়া হইতে পারমিতা উচ্চ কণ্ঠে অবিরাম বলিতে থাকে—"তোরা নিয়ে যা—তোদের রক্ত জল করা ধান, তোরা স্বচ্ছন্দে নিয়ে যা। ও তোদের ; তোদের মুখের গ্রাস, যত পারিস যেমন করে পারিস নিয়ে যা, নিয়ে যা, নিয়ে যা।"